কাজী নজরুল ইসলাম

শিউলি-মালা

সূচিপত্র

পদ্ম-গোখ্‌রো ৫

জিনের বাদ্‌শা ২০

অগ্নি-গিরি ৩৭

শিউলী-মালা ৫০

পদ্ম-গোখরো

রসূলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানা-ঘুষা করিতে লাগিল তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারী কয়েক বৎসরের মধ্যেই "ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে, নির্মূল" অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমন কি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোনো খান্দানী জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ীর মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ীর বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশী।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত রূপ অমন বংশ-বর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে— ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পরিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তব-শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপ খ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁত্ খুঁত করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্ন হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘরে আবার সোনা-দানায় ভ'রে উঠবে।"

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের "পয়" বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মীর-বাড়ীতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয় রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীরবাড়ীর এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়ত বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মত একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলা বাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশী দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ও সাপটাকে মারতেই হবে, নৈলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!" বালিয়া বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ-দুগ্ধ-ধবল গোখরো সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দুর বর্ণ চক্র বা

খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, "মারিস্ নে মারিস্ নে, ও বাস্তু সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম-গোখ্‌রো!"

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখরোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।" আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "কই রে, সে রকম কোন শব্দ ত শুনিনি।"

আরিফ বলিল, "আমরা তখন সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়ত শুনতে পাইনি।"

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের দুই চারটি ইট সরাইতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চক্‌চক্ করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘন্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসী বাদশাহী আশরাফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসী উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসী উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে।"

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়! প্রথমটা ওই দিকে চ'লে গেছে, আমি দেখেছি।"

কিন্তু এ সাপটা প্রথমই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসী ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখরো মারিতেও নাই।

কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখ্‌রো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসীর একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসী ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসী তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুদ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁঝি পোকার মত

শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, "ওই আগের সাপটা! এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে! আহা, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে!"

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অবাক বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

কলসীতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবে—ভাবিয়া পাইল না।

শ্বশুর-শাশুড়ী অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "সত্যিই মা, তোর সাথে মীর-বাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো!"

কিন্তু এই সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর-পরিবারের সহজ জীবন যাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্ত বধূর "পয়" দেখিয়াই বোধ হয়—আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীর-বাড়ীর পুরাতন-প্রাসাদের পরিপূর্ণ রূপে সংস্কার হইল। বাড়ী-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কন্‌ট্রাক্টরী হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোন কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

।। ২ ।।

এই অর্থ-প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখ্‌রো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ-কলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর শাশুডী স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প—মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ীর সর্বত্র চলা-ফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ ত! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতমহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব। তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শূইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ী দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়!

বধূ শাশুড়ী খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

ভয়ে শাশুড়ীর পেটের ভাত চা'ল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটিতে শয়ন করে!

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মত তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মত নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতি-পটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা কারিতে আসিয়াছে! তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সন্তান হৃদয় মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ সর্প-শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়,সস্নেহ তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোন উপায়ও নাই! তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত-ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিস্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ—তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না! রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার ত কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধ বেশে বলিয়াছিল, "জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশী শান্তিময় ছিল।"

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রুভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে! বলে, "ওরা আমার ছেলে! ওরা ত কোন ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না ত ওরা!

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশী সুখের হত!"

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে! ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা,পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছু দিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়ত সেখানে গিয় সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা বহুদিন বাপের বাড়ী যাওনি, তোমার বাবাকে দু'তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এস।"

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতা-মাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-কান্তি স্বর্ণ-ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতা-মাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু'একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন," হাঁরে আরিফকে চিঠি লিখ্ব আসতে?"

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, "না মা, উনি ত শনিবারেই আসবেন!"

জামাই আসিল, তবু কন্যায় চোখেমুখে পূর্বের মত সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, "সত্যি বল্‌ত জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?"

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না মা! উনি ত আগের মতই আমায় ভালোবাসেন! বাড়ীতে আমার দুটি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।"

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ীর প্রথা মত সেই সন্তান দুটিকে বাড়ীরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া এ কথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোন কথা বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশী ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবার আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, "বাবা! জোহরা ত একরকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর কি কোনো রোগ বেরামই হ'ল, তাও ত' বুঝতে পারছিনে—দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!"

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়ত সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসূলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই এক দিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ীর কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহার জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা—একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়!

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য-প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, "বাবা, জান ত আমরা কত গরীব! মেয়ে ত শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা ত দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছু দিনের জন্য ওকে কলকাতায় বা বাড়ীতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হ'লে ওকে আবার রেখে যেয়ো!" বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসূলপুরে লইয়া যাইবে।

॥ ৩ ॥

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক-বোধ হয় স্ত্রীলোক জোহবার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে! ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপরহণ করিয়া লইয়াছে!

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া থাকিল, যেন সে আঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বে আর একটি কামরা—স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টীলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনাপত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা!

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসূলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, "তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক, তোমাকে ত চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক্। আর তা ছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না!"

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল, ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ী—জোহরার মাতা।

দুদিন আগের ঝড়ে ঘরের কতগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ী সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী।

সে আর উচ্চবাচ্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল, তাহার শাশুড়ীর পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন পথে দেখিতে পাইল, ঐ ডাকাতও আর কেউ নয়—তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপই হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি বাটী বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে!

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়বিমূঢ়তার মত চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।"

বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ীর ক্রন্দন থামিয়া গেল! শ্বশুর-শাশুড়ী দুই জনে পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, "কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?"

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "জি হাঁ দেখেছি! কলিকাল কিনা, তাই সব কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!"

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে, হয়ত এ ব্যাপরে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলিল, "সে এখনি এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্ত থাকিবে না।

শ্বশুর-শাশুড়ী যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমন কি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, "আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি , আমি কোন অপরাধ করিনি!"

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজী হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশ মত জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছুই প্রশ্ন করিল না

।। ৪ ।।

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জমাতার হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে না। অন্তত সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ীর বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজী হইল, সে আজ দেখিবে—মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ্ করিতে লাগিল, সে এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ্ ধরিল, না সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমির পর বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল! সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল—"রাক্ষুসী!"

আরিফের বুঝিতে বাকী রহিল না সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না! এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতা-মাতাকে বলিয়া যাইবে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত-বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার চীৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাক-পরা বাঙ্গালী চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এটা ফার্স্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও।"

আরিফ কোন কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙ্গালী সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র বলিল, "আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—'

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলের এক বড় জমিদার বাড়ীর "কলে" গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া, তাহার সাহায্যে আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ইঞ্জেকশন দিলেন। দুই তিনটা ইঞ্জেকশন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ী থামান নাই। কারণ গাড়ী কলিকাতা পঁহুছিতে দেরী হইলে হয়ত এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পঁহুছিলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হোক!

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতা-মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়ীতে ভিড় করিতে পরিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

।। ৫ ।।

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতা হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ী ফিরিয়াছে।

আশ্চর্য! সে বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা ত মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না!

সে তখনও জানে না যে, সে আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারি প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, "একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?"

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, "কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।"

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাৎ করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ীতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ীর দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কি থামিল।

জোহরা পাল্কি হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি এসেছ—বেঁচে ফিরে এসেছ?"

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোরা দু'জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?"

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, "আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে।"

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, "না, না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার।"

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, "এই নাও শাস্তি!"

।।৬।।

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখরোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে! কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে! সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী!

বাড়ীতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, "মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ! মা! একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!" "খোকা" "খোকা" বলেয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখেই মীর-পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট্ট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই-গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়াছে বাবা! খোকা!"

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াচিল—জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখরো-যুগল।

জোহরা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়্‌লো?" জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মত তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারে বারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—মা গো বড় ক্ষিদে! তুমি ত ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে !

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মত বাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা!

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ী উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, কি হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!"

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!"

শাশুড়ী বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু' একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা শুন্‌লে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না! চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!"

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপানবশতঃই নির্জীবের মত বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

।। ৭ ।।

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ীর একজন দাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও মা গো, ভূতে ধরলে গো! জিনের বাদ্‌শা গো! জিন ভূত!"

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়ীময় ভীষণ হৈচৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "হাঁ রে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা ত বলিস্ নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।"

আরিফ বলিতেছিল, "কিন্তু এখন ত ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে ত সাত মাস।"

এমন সময় বাড়ীময় শোরগোল উঠিল, "ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত!"

বাড়ীর চাকর-চাকরানী সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে—জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ীর মধ্যে আমগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া আছে !

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই ত কে যেন গাছ-তলায় প্রেতমূর্তির মত দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে!"

জোহরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা তুমি!" আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিলেন, "য়্যাঁ, বেয়াই?"

জোহরা তখন চীৎকার করিতেছে, "ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মার ! মেরে বের করে দাও!"

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চীৎকার করিতেছে—"ওরে বাপ্‌রে সাপে খেয়ে ফেল্‌লে! আমায় সাপে খেয়ে ফেললে!"

জোহরা উন্মাদিনীর মত তাহার শাশুড়ীর হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল—"ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেল্‌লে! ওকে ধর! ওকে ধর!"

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছ-তলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার "খোকা" এবং একবার "বাবা" বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখ্‌রো? আমার বাবা?"

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, "জোহরা! জোহরা! কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে! তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখ্‌রোর কামড়ে!"

তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়ত তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরানী দেখতে পেয়ে ভূত বলে চীৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখ্‌রো তাঁকে তাড়া করে!"

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক্‌। আমার পদ্ম-গোখরো—আমার খোকারা কোথায় বল!"

আরিফ বলিল, "তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!"

জোহরা, "এ্যাঁ খোকারা নাই?" বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

জিনের বাদ্‌শা

ফরিদপুর জেলায় "আরিয়ল খাঁ" নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম । নাম মোহনপুর। অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী মুসলমান। গ্রামের একটেরে ঘরকতক কায়স্থ। যেন ছোঁয়াচের ভয়েই ওরা একটেরে গিয়ে ঘর তুলেছে।

তুর্কী ফেজের উপরের কালো ঝাণ্ডিটা যেমন হিন্দুত্বের টিকির সাথে আপোষ করতে চায়, অথচ হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি গ্রামের মুসলমানেরা কায়স্থ-পাড়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলেও কায়স্থ-পাড়া কিন্তু ওটাকে ভূতের বন্ধুত্বের মতই ভয় করে!

গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চুন্নু ব্যাপারী মাতব্বর লোক। কিন্তু মাতব্বর হ'লেও সে নিজে হাতেই চাষ করে। সাহায্য করে তার সাতটি ছেলে এবং তিনটি বউ। কেন যে সে আর একটি বউ এনে সুন্নত আদায় করেনি, তা সে-ই জানে। লোকে কিন্তু বলে, তার তৃতয়ী পক্ষটি একেবারে 'খরে-দজ্জাল' মেয়ে। এরই শতমুখী অস্ত্রের ভয়ে চতুর্থ পক্ষ নাকি ও-বাড়ী মুখো হ'তে পারেনি। এর জন্য চুন্নু ব্যাপারীর আফ্‌সোসের আর অন্ত ছিল না। সে প্রায়ই লোকের কাছে দুঃখ ক'রে বলত, "আরে, এরেই কয়—খোদায় দেয় ত জোলায় দেয় না! আল্লা মিয়া ত হুকুমই দিছেন চারড্যা বিবি আন্‌বার, তা কপালে নাই, ওইবো কোহান-থ্যা!" বলেই একটু ঢোক গিলে আবার বলে, "ওই বিজাত্যার বেডিরে আন্যাই না এমনড়া ওইলো!" ব'লেই আবার

কিন্তু সাবধান ক'রে দেয়, "দেহিও বাপু, বারিত্ গিয়া কইয়্যা দিয়ো না। হে বেডি হুন্‌ল্যা এক্কেরে দুপুর্‌য়া মাতম লাগাইয়া দিবো!"

এই তৃতীয় পক্ষেরই তৃতীয় সন্তান "আল্লা-রাখা" আমাদের গল্পের নায়ক। গল্পের নায়কের মতই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে! গ্রামে কিন্তু এর নাম 'কেশরঞ্জন বাবু'। এ নাম প্রথম দেয় ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ে। নাম তার 'চান ভানু,' অর্থাৎ চাঁদ বানু। সে কথা পরে বলছি।

চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় পক্ষের দুই-দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখলে আল্লা-রাখা। আল্লাকে রাখতে দেওয়া হ'ল যে ছেলে, অন্ততঃ তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে—আর কেউ না হোক-মা তার নিশ্চিন্ত হয়ে রইল! আল্লা হয়ত সেদিন প্রাণ ভ'রে হেসেছিলেন! অমন বহু 'আল্লা-রাখা'কে আল্লা 'গোরস্থান-রাখা' করেছেন, কিন্তু এর বেলায় যেন রসিকতা করেই একে সত্যি সত্যিই জ্যান্ত রাখলেন! মনে মনে বল্‌লেন, "দাঁড়া, ওকে বাঁচিয়ে রাখ্‌ব, কিন্তু তোদের জ্বালিয়ে মেরে ছাড়ব!" সে পরে মরবে কিনা জানি না, কিন্তু এই বিশ্‌টে বছর যে সে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ গাঁয়ের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে! তার বেঁচে থাকাটা প্রমাণ করার বহর দেখে গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, ও গুয়োটা আল্লা-রাখা না হয়ে যদি মাম্‌দোভূত হ'ত, তা হ'লেও বরং ছিল ভাল। ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না!

ওকে মুসলমান্‌রা বল্‌ত, "ইবলিশের পোলা", কায়েতেরা বল্‌ত, "অমাবস্যার জন্মিৎ!" বাপ বলত্ "হালার পো", মা আদর করে বল্‌ত—"আফলাতন!"

এইবার যে মেয়েটির কল্যাণে ওর নাম কেশরঞ্জন বাবু হয়, সেই চান ভানুর একটু পরিচয় দিই।

মেয়েটি ঐ গাঁয়েরই নারদ আলি শেখের। নারদ আলি নামটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাখা নয়। নারদ আলি অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগের মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন যদ্দিনের, তা ওর হাঁটুর বয়েস! বাম পায়ের হাঁটু আর বল্‌লাম না, ওটা অতিরঞ্জন হবে!

নারদ আলি, শেখ রামচন্দ্র, সীতা বিবি প্রভৃতির নাম এখনো গাঁয়ে দশ-বিশটে পাওয়া যায়। অবশ্য, হনুমানুল্লা, বিষ্ণু হোসেন প্রভৃতি নামও আছে কিনা জানিনে!

নারদ আলি গায়ের মাতব্বর না হ'লেও অবস্থা ওর মন্দ নয়। যা জমি-জায়গা আছে তার, তারির উৎপন্ন ফসলে দিব্যি বছর কেটে যায়। ও কারুর ধারও ধারে না, কাউকে ধার দেয়ও না।

দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি! কিন্তু ওর বউটি ঝগড়া-কাজিয়া না করলেও কাজিয়ার ভান ক'রে যে মজা করে, তা অন্ততঃ নারদ আলির কাছে একটু অশান্তিকর ব'লেই মনে হয়। লোক ক্ষ্যাপানো বউটার স্বভাব। কিন্তু সে রসিকতা বুঝতে না পেরে অপর পক্ষ যখন ক্ষেপে ওঠে তখন সে বেশ কিছুক্ষণ কোঁদল করার ভান ক'রে হঠাৎ মাঝ উঠানে ধামাচাপা দিয়ে ব'লে ওঠে, "আজ রইল কাজিয়া ধামাচাপা, খাইয়া লইয়া আই, তারপর তোরে দেখাইবে মজাডা! এই ধামারে যে খুলবো, তার লল্লাটে আল্লা ভাসুরের সাথে নিকা লিখ্ছে!" বলেই এমন ভঙ্গির সাথে সে ধামাটা চাপা দেয় এবং কথাগুলো বলে যে, অন্য লোকের সাথে সাথে— যে ঝগড়া কর্ছিল সেও হেসে ফেলে! অবশ্য, রাগ তাতে তার কমে না।

এদেরি একটি মাত্র সন্তান—চান্ ভানু। পুঁথির কেস্সা শুনে মায়ের আদর ক'রে রাখা নাম!

চান্ ভানু যেন তার মায়েরই ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ! চোখে মুখে কথা কয়, ঘাটে মাঠে ছুটোছুটি করে, আরিয়ল খাঁর জল ওর ভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়!

চৌদ্দ বছর বয়স হ'য়ে গেল, অথচ বাপে বল্লেও মায়ে বিয়ের নাম করতে দেয় না। বলে, চান চ'লে গেলে থাকব কি ক'রে আঁধার পুরীতে। নারদ আলি বেশী কিছু বল্লে বউ তার তাড়া দিয়ে বলে ওঠে, "তোমার খ্যাচ-খ্যাচাইবার ওইবো না, আমার মাইয়্যা বিয়া বস্ব না— জৈগুন বিবির লাহান উয়ার হানিপ যদ্দিন না আয়ে!"

মোহনপুরের জৈগুন বিবি-চান্ ভানুর 'হানিফ' বীরের কিন্তু আসতে দেরী হ'ল না এবং সে হানিফ আমাদের আল্লা-রাখা।

একদিন হঠাৎ আল্লা-রাখার 'সোনাভানে'র পুথি পড়তে পড়তে মনে হ'ল, চান ভানুই সে সোনাভানবিবি এবং সে গাজী হানিফা। তার কারণ, চানের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে ছিল না। সে সোনাভান বিজয়ের জন্য জয়-যাত্রার চিন্তা করতে করতে প'ড়ে যেতে লাগল—

"হানিফার আওয়াজ বিবি শুনিল যখন,
নাশ্তা করিয়া নিল থোড়া আশি মণ।
লক্ষ মণের গোর্জ বিবির হাজার মণের ঢাল,
বারো ঘোড়ায় চ'ড়ে বলে তুলবো পিঠের খাল!"

বাপ্পুরে! এ যে হানিফার বাবা! এ আবার আশি মণ নাশ্তা করে, বারোটা ঘোড়ায় এক সাথে চড়ে! চান্ ভানুও ঐ রকম কিছু করবে নাকি? আল্লা-রাখা রীতিমত হকচকিয়ে গেল। কিন্তু হেরে হেরেও ত হানিফাই শেষে কেল্লা-ফতে করেছিলেন! যা থাকে কপালে! আল্লা-রাখা তার বাব্রি

চুলের মাঝে একটা এবং দুদিকে দুটো— এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, মায় জামায় বেশ ক'রে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ ক'রে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চান্ ভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

এইখানে ব'লে রাখি, আমাদের আল্লা-রাখা পুঁথি প'ড়ে যতদূর আধুনিক হবার—তা হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক চাষার ছেলের মত থাক্ত না, পরিষ্কার ধুতি-জামা-জুতো প'রে লম্বা চুলে তেড়ি কেটে, পান সিগারেট খেতে খেতে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিত এবং কার কি অনিষ্ট করবে তারি মতলব আঁটিত। কিন্তু বয়স তার যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস্ করলেও মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার কোনো দিন করেনি। তার টার্গেট ছিল বেশীর ভাগ বুড়ো-বুড়ির দল; বাড়ীর, মাঠের ফল-ফসল; গাছের আগা, ঘরের মটকা এবং রাত্রে বাঁশঝাড়, তেঁতুলগাছ, তালগাছ ইত্যাদি।

অকারণে বলদ ঠ্যাঙানো বা তাদের দড়ি খুলে দিয়ে বাবাকে লোকের গা'ল খাওয়ান ছাড়া বাবার চাষবাসে অন্য বিশেষ সহায়তা সে করেনি। দু'বার সে মাঠ তদারক করতে গেছিল, তাতে একবার মাঠের পাকাধানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, আর একবার সমস্ত ধান কেটে অন্যের ক্ষেতে রেখে এসেছিল! এরপর তার বাবা আর তাকে সাহায্য করতে ডাকেনি।

তার বিলাসিতার টাকা যখন তার মা একদিন বন্ধ করলে এবং বাবার কাছে চেয়েও তার বাবা যখন ওরই বদলে গড়পড়তা হিসেব ক'রে তার পৃষ্ঠে বেশ কিছু কো'ষে দিলে পাঁচনী দিয়ে, তখন সে বাড়ী থেকে পালিয়েও গেল না, কাঁদলেও না, কারুর কাছে কোনো অনুযোগও করলে না। সেইদিন রাত্রে চুনু ব্যাপারীর বাড়ীতে আগুন লেগে গেল। আলা-রাখা সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধূম্র উদ্গীরণ করতে করতে যা বলে উঠল, তার মানে—আজ দিয়াশলাই কিন্বার পয়সা ছিল না, ভাগ্যিস ঘরে তাদের আগুন লেগেছিল তাই সিগারেটটা ধরানো গেল।

তার বাবা যখন আল্লা-রাখাকে ধ'রে দুর্মুশ-পেটা ক'রে পিটোতে লাগ্ল, সে তখন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে মা'র খেতে খেতে বল্তে লাগ্ল, যে, সকালে মা'র খেয়ে বড্ডো পিঠ ব্যথা করাতেই ত সে পিঠে সেঁক দেবার জন্য ঘরে আগুন লাগিয়েছে! আজ আবার যদি পিঠ বেশী ব্যথা করে, পাড়ার কারুর ঘরে আগুন লাগিয়ে ও ব্যথায় সেঁক দিতে হবে।

এই কবুল জবাব শুনে ওর বাবার যেটুকু মার্বার হাত ছিল, তাও গেল ফুরিয়ে! সে ছেলের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলতে লাগ্ল, "তোর পায়ে পড়ি পোড়াকপাল্যা, হালার পো, ও কম্মডা আর করিস্ না, হক্কলেরে জেল্লে যাইবার অইবো!" যাক্, সেদিন গ্রামের লোকের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়ে গেল যে, অন্ততঃ গ্রামের কল্যাণের জন্য ওর বাবা ওর বাবুয়ানার খরচটা চালাবে!

আল্লা-রাখা গম্ভীর হয়ে সেদিন বলেছিল, "আমি বাপ্‌কা বেটা, যা কইবাম, তা না কইর‍্যা ছারতাম না!" সকলে হেসে উঠ্‌ল এবং যে বাপের বেটা সে সেই বাপ তখন ক্রোধে দুঃখে কেঁদে ফেলে ছেলেকে এক লাথিতে ভূমিসাৎ ক'রে চীৎকার করে উঠ্‌ল— "হুনছনি হালার পোর কতা! হালার পো কয়, বাপ্‌কা বেডা! তোর বাপের মুহে মুতি!"।এবার আল্লা-রাখাও হেসে ফেল্‌লে!

যাক্— যা বলছিলাম। ধোপ-দোরস্ত হয়ে আল্লা-রাখা অবলীলাক্রমে নারদ আলির উঠোনে গিয়ে ঠেলে উ'ঠে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—"নারদ ফুফা, বারিত্‌ আছনি গো!" এই চির-পরিচিত গলার আওয়াজে বাড়ীর তিনটি প্রাণী এক সাথে চ'ম্‌কে উঠ্‌লো! চানের মা ব'লে উঠ্‌ল, "উই শয়তানের বাচ্চাডা আইছে!"

চান্‌ ভানু তখন দাওয়ায় ব'সে একরাশ পাকা করমচা নিয়ে বেশ ক'রে নুন আর কাঁচা লঙ্কা ডলে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে টাক্‌রায় টোকার দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার কর্‌ছিল। সে তার টানা টানা চোখ দুটো বার দুয়েক পাকিয়ে আল্লা-রাখার তিন তেড়িকাটা চুলের দিকে কটাক্ষ ক'রে বলে উঠল, "কেশরঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাড়ুলিডা লইয়া আইও।" ব'লেই সুর ক'রে বলে উঠ্‌ল—

"এস কুডম বইয়ো খাটে,
পা ধোও গ্যা নদীর ঘাটে,
পিঠ ভাঙবাম্‌ চেলা কাঠে!"

ব'লেই হি হি ক'রে হেসে দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢু'কে পড়ল!

আল্লা-রাখা এ অভিনব অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে রণে ভঙ্গ দিল। মোহনপুরের হানিফার এই প্রথম পরাজয়!

এ কথাটা চান্‌ ভানুর মায়ের মুখ হ'তে মুখান্তরে ফিরে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। এর পর থেকেই আল্লা-রাখাকে দেখলে, সকলে, বিশেষ ক'রে মেয়েরা ব'লে উঠ্‌ত—"উ-ই কেশরঞ্জন বাবু আইত্যাছেন!"

অপমান কর্‌লে চান্‌ ভানু এবং আল্লা-রাখা তার শোধ তুল্‌লে সারা গাঁয়ের লোকের উপর। আল্লা-রাখা পান-সিগারেট খাইয়ে গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তালিম দিয়ে দিয়ে প্রায় তৈরী ক'রে এনেছিল! তাদেরি সাহায্যে সে রাত্রে সে গ্রামের প্রায় সকল ঘরের দোরের সামনে যে সামগ্রী পরিবেশন ক'রে এল, তা দেখলেই বমি আসে—শুঁক্‌লে ত কথাই নেই!

গ্রামের লোক বহু গবেষণাতেও স্থির ক'রতে পার্‌লে না, অত কলেরার রুগী কোত্থেকে সে রাত্রে গ্রামে এসেছিল! তা' ছাড়া তেঁতুল-পাতা খেয়ে যে মানুষের বদহজম হয়, এও তাদের জানা ছিল না! গো-বর, 'নর-বর' ও শচানী ঘাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার সংমিশ্রণের হেতু না হয় বোঝা গেল; কিন্তু ও মিক্‌শ্চারের সাথে তেঁতুল-পাতার সম্পর্ক কি? কিন্তু এ রহস্য ভেদ

করতে তাদের দেরী হ'ল না যখন তারা দেখ্‌লে-আর সব দ্রব্য অল্প আয়াসে উঠে গেলেও 'তেঁতুল-পাতা কিছুতেই দোর ছেড়ে উঠতে চাইল না! বহু সাধ্য-সাধনায় নিস্ফলকাম হয়ে দোরের মাটি সুদ্ধ কুপিয়ে তুলে যখন তিন্তিড়ি-পত্রের হাত এড়ানো গেল, তখন সকলে একবাক্যে বল্‌লে—না; ছেলের বুদ্ধি আছে বটে! তে'তুল-পাতার যে এত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তা সেদিন প্রথম গ্রামের লোক অবগত হ'ল!

সারা গ্রামে মাত্র একটি বাড়ী সেদিন এই অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেলে। সে চান্‌ ভানুদের বাড়ী। নিজের বাড়ীকেও যে রেহাই দেয়নি, সে-যে কেন বিশেষ ক'রে চান্‌ ভানুরই বাড়ীকে—যার ওপর আক্রোশে ওর এই অপকর্ম—উপেক্ষা করলে, এর অর্থ বুঝতে অন্ততঃ চান্‌ ভানুর আর তার মা-র বাকী রইল না!

সে যেন বল্‌তে চায়—দেখলে ত আমার প্রতাপ! ইচ্ছে কর্‌লেই তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারতাম, কিন্তু নিলাম না! তোমাকে ক্ষমা কর্‌লাম।

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে পরদিন সকালে চান্‌ ভানু হঠাৎ কেঁ'দে ফেললে! ক্রোধে অপমানে তার শুক্লপক্ষের চাঁদের মত মুখ—কৃষ্ণপক্ষের উদয়-মুহূর্তের চাঁদের মত রক্তাভ হয়ে উঠল। তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'চান্‌, কাঁদছিস কিয়ের ল্যাইগ্যা রে! তোর বাপে বক্‌ছে?" চান্‌ ভানু বাপ-মায়ের একটি মাত্র সন্তান ব'লে যেমন আদুরে, তেমনি অভিমানী। তার মা মনে কর্‌লে ওর বাবা বুঝি মাঠে যাবার আগে মেয়েকে কোনো কারণে ব'কে গেছে।

চান্‌ আরো কেঁ'দে উঠে যা ব'লে উঠ্‌লো তার মানে—কেন আল্লা-রাখা তাদের এ অপমান কর্‌বে। সকলের বাড়ীতে অপকর্মের কীর্তি রেখে ওদের বাদ দিয়েও গ্রামবাসীকে জানাতে চায় সে ওদের উপেক্ষা করে—ক্ষমার্হ ওরা! এর চেয়ে ওর অপমান যে ঢের ভালো ছিল।

মা মেয়েকে অনেকক্ষণ ধ'রে বুঝালো। কা'ল অমন ক'রে ওকে অভ্যর্থনা করার দরুনই যে সে এসব করেছে তাও বললে। চান্‌ ভানুর মন কিন্তু কিছুতেই আর প্রসন্ন হয়ে উঠল না। আল্লা-রাখা কাঁটার মত তার মনে এসে বিঁধতে লাগ্‌ল।

আল্লা-রাখা হানিফার মতই তীরন্দাজ। তার প্রথম তীর ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে।

সেদিন দুপুরে যখন চান্‌ ভানু আরিয়ল খাঁতে স্নান করতে যাচ্ছিল, তখন তার ম্লান মুখ দেখে আল্লা-রাখা যেমন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠল, তেমনি তার বুকে কাঁটার মত কি একটা ব্যথা যেন খচ ক'রে উঠল। আহা! ওর মুখ

মলিন! নাঃ, চান্ ভানুও সোনাভানের মতই তীর ছুঁড়তে জানে। তারও অলক্ষ্য লক্ষ্য ঠিক জায়গায় এসে বিঁধল।

আল্লা-রাখার চোখে চোখ পড়তেই ম্লানমুখি চান্ ভানুর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। এ হাসির জন্য সে একবারে প্রস্তুত ছিল না! এত বড় শয়তানের এমন চুনিবিল্লির মত মুখ! এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়!

কিন্তু হেসেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এ হাসির যদি আল্লা-রাখা অন্য মানে ক'রে বসে! ছি ছি ছি ছি!

কিন্তু চান্ ভানুকে এ লজ্জার দায় বেশীক্ষণ পোহাতে হ'ল না। ওর হাসির ছুরি একটু চিক্‌চিকিয়ে উঠতেই আল্লা-রাখা রণে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। সে মনে করলে, এ হাসির বিজলীর পরেই বুঝি ভীষণ বজ্রপাত হবে! চান্ দেখতে পেল, অদূরে একটা বিরাট বহুকালের পুরোনা অশ্বথ গাছে আল্লা-রাখা তর তর ক'রে উ'ঠে একেবারে আগডালে গিয়ে বসল। কি ভীষণ ছেলে বাবা! ও গাছে যে সাপ আছে সবাই বলে! যদি সাপে কামড়ে দেয়, যদি ডাল ভেঙে পড়ে যায়। চান্ ভানু খানিক দাঁড়িয়ে ওর কীর্তি-কলাপ দেখে এই ভাবতে ভাবতে নদীর জলে স্নান করতে নাম্‌ল।

নদীতে নেমেই তার মনে হ'ল, ছি ছি, সে করেছে কি ! কেন সে ঐ বাঁদরটাকে অতক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে! ও যে আস্কারা পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বস্‌সে! না জানি সে এতক্ষণ কি মনে কর্‌ছে!

তার আর সে দিন সাঁতার কাটা হ'ল না। আরিয়ল খাঁর জল আজ যেন হাঁফ ছেড়ে ব'াচল! চান্ ভানু চুপ ক'রে গলা-জলে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আজ তার এই প্রশ্নই মনে বারে বারে উদয় হয়েছে— কেন আল্লা-রাখা ওদের বাড়ী কা'ল অমন করে গিয়েছিল! ও ত কারুর বাড়ীর ভিতর সহজে যায় না। কেন সে ওকে দেখে অমন ক'রে তাকিয়ে ছিল। তারপর সারা গাঁয়ের লোকের উপর অত্যাচার ক'রে কেনই বা তার অপমানের প্রতিশোধ নিলে, ওকেই বা কিছু বল্‌লে না কেন! ও শুধু বাঁদর নয়, ও বুঝি পাগলও!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হল, সে বুঝি অশ্বথ গাছ থেকে তাকে দেখছে। অনেকটা দূরে অশ্বথ গাছটা। তবু সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল, অশ্বথ গাছটার ওধারের ডাল থেকে কখন্ সে এ ধারের ডালে এসে ওরির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। কি বালাই! চান্ ভানুর মনে হতে লাগ্‌ল, ও বুঝি আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠ্‌তে পারবে না! ওকে ত আরও কতবার দেখেছে, ওরই সাম্‌নে সাঁত্‌রেওছে এই নদীতে; কিন্তু এ লজ্জা—এ সঙ্কোচ ত ছিল না ওর। কি কুক্ষণে কাল-সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়ীতে পা দিয়েছিল!

ও যেন কালবোশেখীর মেঘের মত, যত ভয় করে, তত দেখতেও ইচ্ছে করে!

এবারেও তাকে আল্লা-রাখা মুক্তি দিল। চান্ ভানু দেখলে, আল্লা-রাখা গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে।

এইবার তার ভীষণ রাগ হল ঐ হতচ্ছাড়ার উপর। সে মনে করে কি! সে কি মনে করে, সে'গাছে বসে থাকলে ও স্নান করে উঠে যেতে পারে না? তাই সে দয়া করে নেমে গেল! ও কি মনে করেছিল, পথে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চান্ ভানু তার নদীতে যেতেই পারবে না, ভয়ে লজ্জায়? তাই সে পথ ছেড়ে চলে গেছিল? চান্ নিষ্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে লাগল। আজ সে দেখিয়ে দেবে যে, যত বড় শয়তান হোক সে, তাকে চান্ ভানু থোড়াই কেয়ার করে। জলের মধ্যেও তার শরীর যেন জ্বলতে লাগল। তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে উঠে সে জোরে জোরে পথ চলতে লাগল! এবার যদি পথে দেখা পায় তার, তা হ'লে দেখিয়ে দেবে কেমন ক'রে ওর নাকের তলা দিয়ে চান্ হন্‌হনিয়ে চলে যেতে পারে ! ওকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না!

কিন্তু কোথাও কেশরঞ্জন বাবুর কেশাগ্রও সে দেখতে পেল না! এবারেও সেই অপমান, সেই দয়া? ওকে চান ঘৃণা করে—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে! কিন্তু এ কি, ওকে একটু অপমান কর্‌তে পারল না বলেই কি মনটা এমন হঠাৎ মলিন হয়ে উঠল? ওকে পথে দেখতে পেল না বলে মটনা ক্রমে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল কেন? যে জোরে সে নদী থেকে আসছিল, পায়ের সে জোর গেল কোথায়? এ কি হ'ল আজ চানের? ওর ঘাড়ে কি তবে ভূত চাপ্‌লে?

পঞ্চশরের ঠাকুরটির শরে কেউটে সাপের মতই হয়ত তীব্র বিষ মাখানো থাকে। শর বিঁধা মাত্র ও বিষ সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ছেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে! নৈলে এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে চানের অবস্থা এমন সঙীন হয়ে উঠত না! ওকে ভূলতেও পারে না, মনে করতেও শরীর রাগের জ্বালায় তপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ প্রথম চান্ ভানুর আহারে অরুচি হ'ল। মা প্রমাদ গুণলে। আইবুড়ো মেয়ে বেশী বড় হ'লে কেন যে ভূতগ্রস্ত হয়— মা যেন আজ তা বুঝতে পার্‌ল। গোপনে চোখ মুছে মনে মনে বল্‌লে, ভূতে নজর দিয়েছে মা—আর তোকে রাখা যাবে না, এইবার তোর মায়া কাটাতে হবে !

নারদ আলি আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন তার বউ মেয়ের পাত্র-সন্ধানের জন্য বলল তাকে। কোনো কথা হ'ল না, দুই জনারই চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

।।২।।

চান্ ভানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর মাসখানেক মাত্র বাকী। পাশের গাঁয়ের ছেরাজ হাল্‌দারের ছেলের সাথে বিয়ে।

মোহনপুরের হানিফা, আমাদের আল্লা-রাখা চান ভানুর কেশরঞ্জন বাবু—এ সংবাদে একেবারে 'মরিয়া হইয়া' উঠ্‌ল। ইস্ পার কি উস্‌পার! তার

চান্ ভানুকে চাই-ই চাই! সে জানত, চান্ ভানুর বাপ-মা কিছুতেই তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করা নিরর্থক। তার মাথায় তখন জৈগুন সোনাভানের কাহিনী হর্দম ঘুরপাক খাচ্ছে। সে চান্ ভানুকে হরণ ক'রে দেশান্তরী হয়ে যাবে! কিন্তু ওপথের একটা মুশকিল এই যে, ওতে চান ভানুর সম্মতি থাকা দরকার। কি করে ওর সম্মতি নেওয়া যায়?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশটা দিন কেটে গেল, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘট্‌ল না। এগায় দিনের দিন আল্লা আল্লা-রাখার পানে যেন মুখ তু'লে চাইলেন।

এর মধ্যে কতদিন দেখা হয়েছে চান্ ভানুর সাথে তার, কিন্তু কিছুতেই একবারের বেশী দুবার ওর চোখের দিকে সে তাকাতে পারেনি। যার ভয়ে সারাগ্রাম থরহরি কম্পমান, তার কেন এত ভয় করে এইটুকু মেয়েকে— আল্লা-রাখা ভেবে তার কুল-কিনারা পায় না। কিন্তু আর ত সময় নাই, আর ত লজ্জা কর্‌লে চলে না। কত মতলবই সে ঠাউরালে। কিন্তু কিছুতেই কোনোটা কাজে লাগাবার সুযোগ পেলে না।

আজ বুঝি আল্লা মুখ তুলে চাইলেন! সেদিন সন্ধ্যায় চান্ ভানু যখন জল নিতে গেল নদীতে, তখন নদীর ঘাট জনমানবশূন্য।

চান্ ভানু নদীর জলে যেই ঘড়া ডুবিয়েছে—অম্‌নি একটু দূরে ভুস ক'রে একটা জল-দানোর মুখ মালসার মত ভেসে উঠল এবং সেই মুখ থেকে আনুনাসিক স্বরে শব্দ বেরিয়ে এল— "তুই যদি আল্লা-রাখারে ছ্যাইর‍্যা আর কারেও সাদি করিস, হেই রাত্রেই তোদের ঘাড় মট্‌কাইয়া আমি রক্ত খাইয়া আইমু!" চান্ ভানু ঐ স্বর এবং ঐ ভীষণ মুখ দেখে একবার মাত্র "মা গো" ব'লে জলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল! এই শুভ অবসর মনে ক'রে জল-দানো নদী হ'তে উ'ঠে এল এবং তার মাথা থেকে নানা রঙের বিচিত্র মালসাটা খুলে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে চান্ ভানুকে কোলে ক'রে ডাঙায় তুলে আন্‌লে। এ জল-দানো আর কেউ নয়, এ আমাদের সেই বিচিত্রবুদ্ধি আল্লা-রাখা ওর্ফে কেশরঞ্জন বাবু!

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চান্ ভানুর চৈতন্য হ'ল। চৈতন্য হ'তেই সে নিজেকে আল্লা-রাখার কোলে দেখে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উ'ঠে বল্‌ল, "তুমি কোহান থ্যা আইলে।" ঝর্‌বার সময় বাঁশপাতা যেমন ক'রে কাঁপে, তেমনই ক'রে সে কাঁপতে লাগল। আল্লা-রাখা বল্‌ল, "এই দিক দিয়া যাইতেছিলাম, দেহি কেডা জলে ভাস্‌তে আছে, দেইহ্যা ছুড্যা জলে ফাল দিয়া পর্‌লাম, তুইল্যা দেহি তুমি! আল্লারে আল্লা, খোদায় আনছিল আমারে এই পথে, নইলে কি অইত! কি অইছিল্ তোমার?"

দু'চোখ্ ভরা কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিয়ে চান্ ভানু আল্লা-রাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল! তারপর জল-দানোর বাণীগুলি বাদ দিয়ে বাকী সব ঘটনা বললে......।

আল্লা-রাখা যখন চান্ ভানুকে নিয়ে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সব কথা বললে—তখন তাদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে' গেল। চান্ ভানুর বাপ—মা কাদঁতে কাঁদতে প্রাণ ভ'রে আল্লা-রাখাকে আশীর্বাদ করল। আল্লা-রাখা তার উত্তরে শুধু চান ভানুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে "কেমন! তোমার কেশরঞ্জন বাবুর পিঠ ভাঙ্‌বা নি চেলা কাঠ দিয়া?"

আজ হঠাৎ যেন খুশীর তুফান উথলে উঠেছিল চান্ ভানুর মনে। এই খুশীর মুখে হঠাৎ তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, "খোদায় যদি হেই দিন দেয়, ভাঙ্‌বাম পিঠ!" ব'লেই কিন্তু লজ্জায় তার মাটির ভিতরে মুখ লুকিয়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগল! ও কথার অর্থ ত আল্লা-রাখার কাছে অবোধ্য নয়! কিন্তু সে দিন ত খোদা দেবেন না। কুড়ি দিন পরে যে সে হালদার বাড়ীর বৌ হয়ে চলে যাচ্ছে! এ কি করল সে! সে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল! তার কেবলি ডুকরে ডুকরে কান্না পেতে লাগল।

আল্লা-রাখাও সেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। চান্ ভানুর বাপ-মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কি হ'ল! কী এর মানে?

আল্লা-রাখা আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে নদীর ধারে ছুটে গেল। তখন চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশের সীমানা আলো ক'রে। আল্লা-রাখার মনে হ'ল ও চাঁদ নয়, ও চান্ ভানু— ওরই মনের আকাশ আলো ক'রে উঠেছে আজ সে!

রাত্রি দশটা পর্যন্ত নদীর ধারে ব'সে ব'সে তারস্বরে চীৎকার ক'রে সে গান করলে। তার পর বাড়ী ফিরে সে ভাবতে লাগল— শুধু জল-দানোর কথা নয়, জল-দানো যা যা বলেছে, সে কথাগুলো চান্ নিশ্চয় তার বাপ-মাকে বলেছে। কা'লই হয়ত ও সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে ওর বাপ-মা আমাদের বাড়ীতে এসে বিয়ের কথা পাড়বে। আর তা যদি না করে, নদীতে যদি আর না যায়, ডাঙার ভূত ত বেঁচে আছে।

কিন্তু আরও দুটো দিন পেরিয়ে গেলেও যখন সেরকম কোনো কিছু ঘটল না, তখন আল্লা-রাখার বুঝতে বাকী রইল না যে, চান্ ভানু লজ্জায় বা কোনো কারণে জল-দানোর উপদেশগুলো তার বাপ-মাকে জানায়নি। তা হ'লে ওর বাপ-মা অমন নিশ্চিন্ত হয়ে উঠোনে বিয়ের ছানলা তুলতে পারত না। বিফলতার আক্রোশে ক্রোধে সে পাগলের মত হয়ে উঠল। আর দেরী করলে সব হারাবে সে, এবার ভুতদের মুখ দিয়ে সোজা ওর বাপ-মাকেই সব কথা জানাতে হবে! সেদিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত রকম কান্নার শব্দে নারদ আলিদের ঘুম ভেঙে গেল! মনে হ'ল— ওদেরি উঠোনে ব'সে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। নারদ আলি মনে করলে আজও বুঝি পাশের বাড়ীর সোভান তার বৌকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সেই বৌটা ওদের বাড়ী এসে কাঁদছে। তবু সে একবার জিজ্ঞাসা করলে— "কেডা কাঁদে গো, বদনার মা নাকি?" কোনো উত্তর এল না। তেমনি কান্না।

কেরোসিনের ডিবাটা হাতে নিয়ে নারদ আলি বাইরে বিরিয়েই "আল্লাগো" ব'লে, চীৎকার করে, ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল! চানের মা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল— "কি গো, কি অইলো! কেডা?" নারদ আলি তার উত্তর না দিয়ে ১০৫ ডিগ্রি জ্বরের ম্যালেরিয়া রুগীর মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে কেবলি "কুলহুআল্লাহ্" প'ড়ে বুকে ফুঁ দিতে লাগল। তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত তখন ভয়ে সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে! যত হি-হি-হি-হি করে তত "তৌবাআস্তাগ্‌ফার" পড়ে, তত সে আল্লার নাম নিতে যায়— কিন্তু আল্লার "ল" পর্যন্ত এসে ভয়ে জিভে জড়িয়ে যায়।

চান্ ভানুর ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু ভুতের নাম শুনে সে বিছানা কামড়ে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে প'ড়ে আছে!

অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নারদ আলি বল্‌তে লাগল, "আল্লারে আল্লা! (নাকে কানে হাত দিয়ে) তৌবা আস্তাগ্ ফারুল্লা! তৌবা তৌবা! আউজবিল্লা (নাইজবিল্লা নয়!) বিসমিল্লা! আরে আমি বারাইয়া দেহি তাল গাছের লাহান একডা বুইর‍্যা মাথায় পগ্গ বাঁইন্দ্যা খারাইয়া আছে! দশ হাত লম্বা তার দারি! আল্লারে আল্লা! ও জিনের বাদশা আইছিল আমাগো বারিত্!"

শুনে চান্ এবং তার মা দুই জনেরই ভির্মি লাগাবার মত হ'ল। উক্ত তালগাছ-প্রমাণ লম্বা বৃদ্ধ জিনের বাদশা তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে কিনা, তা দেখবারও সাহস হ'ল না কারুর। পাড়ার কাউকে চীৎকার ক'রে ডাকবার মত স্বরও কণ্ঠে অবশিষ্ট ছিল না! গলা যেন কে চেপে ধরেছে ওদের! তার ওপরে লোক ডাক্‌লে যদি জিনের বাদশা চ'টে যায়! ওরে বাপ্‌রে, তাহলে আর রক্ষে আছে! তিন জনে বাতি জ্বালিয়ে ব'সে ব'সে কাঁপতে কাঁপতে আল্লার নাম জপ্‌তে লাগল!

জিনের বাদ্‌শা সে রাতে আর কোনো উপদ্রব কর্‌লে না। আস্তে আস্তে জিনের বাদ্‌শা সামনের আম বাগানে ঢুকে ইশারা কর্‌তেই তিন চার বিচিত্র আকৃতির ভূত বেরিয়ে এল। তারা জিনের বাদ্‌শার বেশ বাস খুলে নিতে লাগল।

সে বেশ এইরূপ ছিল!—

প্রকাণ্ড দীর্ঘ একটা বাঁশের সাথে স্বল্প দীর্ঘ আর একটা বাঁশ আড়াআড়ি ক'রে বাঁধা, দীর্ঘ বাঁশটার আগায় একটা মালসা বসিয়ে দেওয়া; সে মাল্‌সায় নানারকম কালি দিয়ে বীভৎস রকম একটা মুখ আঁকা, সেই মালসার ওপর একটা বিরাট পাগড়ি বাঁধা। মালসার মুখে পাট দিয়া তৈরী য়্যা লম্বা দাড়ি ঝুলানো, আড়াআড়ি বাঁশটা যেন ওর হাত, সেই হাতে দুটো কাপড় পিরানের ঝোলা হাতার মত ক'রে বেঁধে দেওয়া; লম্বা বাঁশটার দুই দিকে দুটো সাদা ধুতি ঝুলিয়ে দেওয়া; সেই ধুতি দুটোর মাঝে দাঁড়িয়ে সেই বাঁশটা

ধরে চলা। অত বড় লম্বা একটা লোককে রাত্রি বেলায় ঐ রকম ভাবে চলে যেতে দেখলে ভূতেরই ভয় পায়, মানুষের ত কথাই নাই!

জিনের বাদশার পোশাক খুলে নেবার পর দেখা গেল— সে আমাদের আল্লা-রাখা!

ভূতের সর্বদার আল্লা-রাখা তার চেলাচামুণ্ডা আসবাবপত্র নিয়ে স'রে পড়ল। যেতে যেতে বল্‌ল, "আজ আর না, আজ জিন দেখলো, কা'ল গায়েবী খবর হুনবো!"

সকালে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল—কা'ল রাত্রে চান্ ভানুদের বাড়ী জিনের বাদশা এসেছিলেন! নারদ আলি বলেছিল, তালগাছের মত লম্বা, কিন্তু গাঁয়ের লোক সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আসমান-ঠেকা ক'রে ছাড়ুলে। মেয়েরা বল্‌তে লাগ্‌ল, "আইবো না, অত বড় মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?"

কেউ কেউ বল্‌ল, চান্ ভানুর এত রূপ দেখে ওর ওপর জিনের আশক হয়েছে, ওর ওপর জিনের নিজের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়ত বাসর ঘরেই ঘাড় মট্‌কে মারবে!

সেদিন সারাদিন মোল্লাজি এসে চান্ ভানুর বাড়ীতে কোরান পড়লেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ্ হল। বলা বাহুল্য, ভূতেরাও এসে মৌলুদ শরীফে শরীক হয়ে সিন্নি খেয়ে গেল! সেদিন রাত্রে সোভান এবং আরো দু'একজন ওদের বাড়ীতে এসে শুয়ে থাক্‌ল।

গভীর রাত্রে বাড়ীর পেছনের তালগাছটায় একটা বাঁশী বেজে উঠল। ঘুম কারুরই হয়নি ভয়ে। সকলে জান্‌লা দিয়ে দেখতে পেল, তালগাছের ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত লম্বা কালো কুচকুচে একটা পা নিচের দিকে নামছে। খড়খড় খড়খড় ক'রে তালগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল। সাথে সাথে ঝরঝর ঝরঝর ক'রে এক রাশ ধুলোবালি তালগাছ থেকে নারদ আলির টিনের চালের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছয়-সাতটা সুপারিগাছ একসঙ্গে ভীষণভাবে দুলতে লাগল। যেন ভেঙে পড়বে। অথচ গাছে কিছু নেই! এর পরে কি হয়েছিল, তার পরদিন সকালে আর কেউ বলতে পারল না, তার কারণ ঐটুকু পর্যন্ত দেখার পর ওরা ভয়ে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়ে গেছিল।

এর পরেও যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, তা লোপ পেয়ে গেল— যখন একটা কৃষ্ণকায় বেড়াল তালগাছের ওপর থেকে তাদের জানালার কাছে এসে পড়ল।

সেইদিন রাত্রে ভূতেদের কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, আর ওদের ভয় দেখানো হবে না দু'চারদিন, তা হলে ওরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তালগাছ থেকে আনা ভূতের পা বা কালো কাপড় মোড়া

বংশদণ্ডটা নাড়তে নাড়তে ভূতেদের সর্দার আল্লা-রাখা বললে, "আমি এক বুদ্ধি ঠাওরাইছি।" ভূতের দল উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল শুনবার জন্য।

আল্লা-রাখা যা বল্‌ল তার মানে—সে ঠিক করেছে কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাপিয়ে আনবে। আর সেই চিঠিটা আর একদিন স্বয়ং জিনের বাদ্‌শা নারদ আলির বাড়ীতে দিয়ে আসবে। বাস্, তা হ'লেই কেল্লা ফতে।

এই সব ব্যাপারে চান্ ভানুর বিয়ের দিন গেল আরও মাসখানিক পিছিয়ে। নানান্ গ্রামের পিশাচ-সিদ্ধ মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীরা এসে নারদ আলির বাড়ীর ভূতের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল! চারপাশের গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল!

সাত আট দিন ধ'রে যখন আর কোনো উপদ্রব হ'ল না, তখন সবাই বললে, এইসব তন্ত্রমন্ত্রের চোটেই ভূতের পোলারা ল্যাজ তুলে পালিয়েছে! যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

এদিকে—দ্বিতীয় দিনের ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরদিন সকালে, আল্লা-রাখা কলকাতার পুঁথি-ছাপা এক প্রেসের ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে সেখানে বহু মুসাবিদার পর নিম্ন-লিখিত চিঠি ও তার যা ছাপা হবে তার কপি পাঠিয়ে দিল। প্রেসের ম্যানেজারকে লিখিত চিঠিটি এইঃ

শ্রীশ্রীহরিনাম ভরসা

মহাশয়,

আমার ছালাম জানিবেন। আমার এই লেখাখানা ভাল ও উত্তমরূপে ছাপাইয়া দিবেন। গরীবের পত্রখানা পাইয়া ৩/৪ দিনের মদ্যে ছাপাইয়া দিবেন আর যদি গবিলতি করেন তবে ঈশ্বরের কাছে ঠেকা থাকিবেন। আর ছাপিবার কত খরচ হয় তাহা লিখিয়া দিবেন। হজুর ও মহাশয় গবিলতি করিবেন না। আর এমন করিয়া ছাপিয়া দিবেন। চারিদিক দিয়া ফেসেং ও অতি উত্তম কাগজে ছাপিবেন। ইতি। সন ১৩৩৭ সাল ১০ বৈশাখ!

আমাদের ঠিকানা
আল্লা-রাখা ব্যাপারী
উর্ফে কেশরঞ্জন বাবু। তাহার হাতে পঁহচে।
সাং মহনপুর,
পোং ড্যামুড্যা
জিং ফরিদপুর। (যেখানে আরিয়ল খাঁ নদী
সেইখানে পঁহচে।)

চিঠির সাথে জিনের বাদশার যে গৈবী বাণী ছাপ্‌তে দিল, তা এইঃ

বিসমিল্লা আল্লাহো আকবর
লা এলাহা এল্লেল্লা
গায়েব

হে নারদ আলি শেখ
তোরে ও তোর বিবিরে বলিতেছি।
তোর ম্যায়্যা চান্ ভানুরে,

চুনু ব্যাপারীর পোলা আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দে। তারপর তোরা যদি না দেছ তবে বহুৎ ফেরেরে পরিবি। তোরা যদি আমার এই পত্রখানা পড়িয়া চুনু ব্যাপারীর কাছে তোরা যদি প্রথম কছ তবে সে বলিবে কিএরে এইখানে বিবাহ দিবি। তোরা তবু ছারিছ না। তোরা একদিন আল্লা-রাখারে ডাকিয়া আনিয়া আর একজন মুন্সী আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।

খবরদার খবরদার

মাজগাঁয়ের ছেরাজ হালদার ইচ্ছা করিয়াছে তার পোলার জন্যে চান্ ভানুরে নিব। ইহা এখনও মনে মনে ভাবে। খবরদার। খবরদার। খোদাতাল্লার হকুম হইয়াছে আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দিতে। আর যদি খোদাতাল্লার হকুম অমান্য করছ তবে শেষে তোর ম্যাইয়্যা ছেম্‌রি দুক্ষু ও জ্বালর মধ্যে পরিবে।

খবরদার—হুঁশিয়ার—সাবধান এই পত্রের উপর ইমান না আনিলে কাফের হইয়া যাইবি।

তোরা আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দেছ বিবাহের শেষে স্বপনে আমার দেখা পাইবি। চান্ ভানু আমার ভইনের লাহান। আমি উহারে মালমাত্তা দিব। দেখ তোরে আমি বার' বার বলিতেছি—তোর ম্যাইয়্যা আল্লা-রাখা ছেম্‌রার কাছে সাদি বহিবার একান্ত ইচ্ছা। তবে যদি এ বিবাহ না দেছ, তবে শেষে আলামত দেখিবি। ইতি

জিনের বাদ্‌শা
গায়েবুল্লা।

এই কপির কোণাতেও বিশেষ করে সে অনুরোধ করে দিল যেন ছাপার চারি কিনারায় 'ফেসেং' হয়।.........

কল্‌কাতা শহর, টাকা দিলে নাকি বাঘের দুধ পাওয়া যায়! এই দৈবী বাণীও আট-দশ দিনের মধ্যে প্রেস থেকে ছাপা হয়ে এল। আল্লা-রাখার আর আনন্দ ধরে না।

আবার ভূতের কমিটি বস্‌ল। ঠিক হ'ল সেই রাতেই ছাপানো গৈবী বাণী নারদ আলির বাড়ীতে রেখে আস্‌তে হবে। জিনের বাদশার সেই পোশাক প'রে আল্লা-রাখা যাবে ওদের বাড়ীতে। যদি কেউ জেগে উঠে, ঐ চেহারা দেখে, তার দাঁতে দাঁত লাগতে দেরী হবে না।

সেদিন রাত্রে জিনের বাদশার গৈবী বাণী বিনা বাধায় চালের মটকা ভেদ করে চান্ ভানুর বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পড়ল। সকাল হ'তে না হতেই আবার গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল।

নারদ আলি ভীষণ ফাঁপরে পড়ল। জিনের বাদশার হুকুম মতে বিয়ে না দিলেই নয় আল্লা-রাখার সাথে, ওদিকে কিন্তু ছেরাজ হাল্দারও ছাড়বার পাত্র নয়। ভূত, জিন, পরী এত রটনা সত্ত্বেও ছেরাজ তার ছেলেকে এই মেয়ের সাথে বিয়ে দেবে দৃঢ় পণ করে বসেছিল। মাজগাঁ এবং মোহনপুরের কোনো লোকই তাকে টলাতে পারেনি। সে বলে, "খোদায় যদি হায়াত দেয়, আমার পোলারে কোনো হালার ভুতের পো মারবার পারব না। একদিন ত ওরে মরবারই অইবো, অর কপালে যদি ভূতের হাতেই মরণ লেহা থায়ে তারে খণ্ডাইব কেডা?"

আসল কথা ছেরাজ অতি মাত্রায় ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল, চান্ ভানু বাপ-মা'র একমাত্র সন্তান, তার ওপর সুন্দরী ব'লে কোনো বদমায়েস লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্তি করছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করত না, বা তাকে ভয় করত না—এমন নয়। তবে সে মনে করছিল, যে লোকটা এই কীর্তি করছে—সে নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ-সিদ্ধ গুণীকে দিয়ে এ সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না! এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোন্ মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে!

ছেরাজের পুত্রও পিতার মতই সাহসী চতুর এবং শেয়ানা। সে মনে করেছিল, বিয়েটা হয়ে যাক— তারপর ভূতটুতগুলো ভাল ক'রে গুণী দিয়ে ছাড়িয়ে পরে বৌ-এর কাছ ঘেঁষবে।

তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ ক'রে ঠিক করলে—শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভ-দৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভ-দৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়ীতে আন্‌বে। 'রুয়ৎ' না হওয়া পর্যন্ত চান্ ভানু বাপের বাড়ীতেই থাকবে।

নারদ আলি ছেরাজ হালদারকে একবার ডেকে পাঠাল তার কাছে। পাশেই গ্রাম। খবর শুনে তখনি ছেরাজ হালদার এসে হাজির হল। ছাপানো "গৈবী বাণী" পড়ে সে অনেকক্ষণ চিন্ত করলে। তারপর স্থির কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, "তুমি যাই ভাব বেয়াই, আমি কইতাছি—এ গায়েবের খবর না, এ ঐ হালার পোলা আল্লা-রাখার কাজ। হালায় কোন্ ছাপাখানা থেইয়া ছাপাইয়া আন্‌ছে। জিনের বাদ্‌শা তোমারে ছাপাইয়া চিঠি দিব ক্যান? জিনের বাদশারে আমি সালাম করি। কিন্তু বেয়াই, এ জিনের বাদশার কাম না। ঐ হালার পো হালার কাম যদি না অয়, আমি পঞ্চাশ জুতা খাইমু।"

সত্যই ত এ দিকটা ভেবে দেখেনি ওরা। কিন্তু জিনের বাদশাকে যে সে নিজে চোখে দেখেছে! ওরে বাপরে ঘর সমান উচুঁ মাথা, এক কোমর দাড়ি, মাথায় পাগ্‌ড়ি! সে অনেক অনুরোধ করল ছেরাজ হালদারকে— হাতে পায়ে পর্যন্ত পড়ল তার, তবু তাকে নিরস্ত করতে পারল না। ছেরাজ বলল, মরে যদি তারি ছেলে মরবে, এতে নারদ আলির ক্ষতিটা কি!

শেষে যখন ছেরাজ ক্ষতিপুরণের দাবি ক'রে চুক্তিভঙ্গের নালিশ করবে ব'লে ভয় দেখালো, তখন নারদ আলি হ্যাঁ'ল ছেলে দিলে।

চান্ ভানুর মা এতদিন কোনো কথা বলেনি। তার মুখে আর পূর্বের হাসি রসিকতা ছিল না। কি যেন অজানা আশঙ্কায় এবং এই সব উৎপাতে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। মা-মেয়ে ঘর ছেড়ে আর কোথাও বেরোত না। জল-দানো দেখার পর থেকে মেয়েকে জল তু'লে এসে দিন মা, তাতেই চান্ ভানু নাইত। আর সে নদীমুখো হয়নি। তাবিজে কবচে চানের হাতে কোমরে গলায় আর জায়গা ছিল না। সোলা বেঁধে যেন ডুবন্ত জাহাজকে ধ'রে রাখার চেষ্টা!

চান্‌ও দিন দিন শুকিয়ে ম্লান হয়ে উঠছিল। সকলের কাছে শুনে শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল, তার উপর জিন বা "আসেবের" ভর হয়েছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার চোখের ঘুম গেল উড়ে, মুখের হাসি গেল মুছে, খাওয়া পরা কোনো কিছুতেই তার কোন মন রইল না। কিন্তু এ ত বড় মজার ভূত! ভুতই যদি তার ওপর ভর করবে—তবে সে ভূত আল্লা-রাখার কথা বলে কেন? ভূতে ত এমনটি করে না কখনো! সে নিজেই আগলে থাকে তাকে—যার ওপর ভর করে। তবে কি এ ভূত আল্লা-রাখার পোষা? না, সে নিজেই এই ভূত?

এত অশান্তি দুশ্চিন্তার মাঝেও সে আল্লা-রাখাকেকেন যেন ভুল্‌তে পারে না। ওর অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি যেন সর্বদা জোর করে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যত মন্দই হোক, চানদের ত কোন অনিষ্টই করেনি সে। অথচ কি দুর্ব্যবহারই না চান্ করেছে ওর সাথে! ওর মনে পড়ে গেল, এর মাঝে একদিন পাড়ার অন্য একটা বাড়ী থেকে নিজেদের বাড়ী আস্‌বার সময় আল্লা-রাখাকে সে পথে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে দেখেছিল। রাস্তায় আর কেউ ছিল না তখন। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লা-রাখা বলেছিল, তাকে সাপে কামড়েছে! কোন্‌খানে কামড়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লা-রাখা তার বক্ষস্থল দেখিয়ে দিয়েছিল। সত্যই তার বুকে রক্ত পড়ছিল। চান্ ভানুর তখন লজ্জার অবসর ছিল না। একদিন ত এই আল্লা-রাখাই তার প্রাণদান করেছিল নদী থেকে তুলে। সে আল্লা-রাখার বুকের ক্ষত-স্থান চুষে খানিকটা রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে আবার

ক্ষতস্থানে মুখ দেবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিল— কি সাপে কাম্‌ড়েছে? আল্লা-রাখা নীরবে চান্‌ ভানুর চোখ দুটো দেখিয়ে দিয়েছিল। তারপর কেমন ক'রে টল্‌তে টল্‌তে চান্‌ ভানু বাড়ী এসে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল আজ আর চানের সে কথা মনে নাই। কিন্তু একথা চান্‌ ভানু আর আল্লা-রাখা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানে না।

চান্‌ ভানু বুঝেছিল— প্রতারণা করে আল্লা-রাখা তার বুকে চানের মুখের ছোঁওয়া পেতে ছুরি বা কিছু দিয়ে বুক কেটে রক্ত বের করেছিল, সাপের কথা একেবারেই মিথ্যা, তবু সে কিছুতেই আল্লা-রাখার উপর রাগ করতে পারল না। যে ওর একটু ছোঁওয়া পাবার জন্য— হোক তা মুখের ছোঁওয়া— অমন ক'রে বুক চিরে রক্ত বহাতে পারে, তার চেয়ে ওকে কে বেশী ভালবাসে বা বাস্‌বে ! হয়ত তার হবু শ্বশুর ছেরাজ যা বলে গেল— তার সবই সত্য তবু ঐ গ্রামের লোকের চক্ষুশূল ছোঁড়াটার জন্য ওর কেন এমন ক'রে মন কাঁদে ! কেন ওকে দিনে একবার দেখ্‌তে না পেলে ওর পৃথিবী শূণ্য বলে মনে হয়!

সত্যিসত্যিই তাকে জিনে পেয়েছে, ভুতে পেয়েছে— হোক সে ভূত, হোক সে জিন, তবু ত সে তাকে ভালবাসে,তার জন্যই ত সে একবার হয় জিনের বাদ্‌শা, একবার হয় তালগাছের একানো'ড়ে ভূত! চানের মনে হতে লাগল, সাপে আল্লা-রাখাকে কামড়ায়নি, কামড়েছে তাকে, বিষে ওর মন জর্জরিত হয়ে উঠল্‌।

মা'র মন অন্তর্যামী। সেই শুধু বুঝল মেয়ের যন্ত্রণা, তার এমন দিনে দিনে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাথা। সেও এতদিনে সত্যকার ভূতকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও আর ফেরবার উপায় নেই। মেয়েকে নিজে হাতে জবাই করতে হবে। দুর্দান্ত লোক ছেরাজ হালদার, এ সম্বন্ধ ভাঙলে সে কেলেঙ্কারীর আর শেষ রাখবে না।

বাপ, মা, মেয়ে তিনজনেই অসহায় হয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

।।৩।।

কিছুতেই কিছু হ'ল না। জীবনে যে পরাজয় দেখেনি, সে আজ পরাজিত হ'ল। জিনের বাদ্‌শা, তার দৈবী বাণী, যত রকম ভুত ছিল— একানো'ড়ে মামদো, সতর চোখীর মা, বেহ্মদোত্তি, কন্ধকাটা—সব মিলেও তার পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না। তা ছাড়া আল্লা-রাখার আর পূর্বের মত সে উৎসাহও ছিল না। যে দিন চান্‌ ভানু তার চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেই দিন থেকে তার রক্তের সমস্ত বিষ—সমস্ত হিংসা দ্বেষ লোভ ক্ষুধা—সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল। তার মনের দুষ্ট শয়তান সেই একদিনের সোনার ছোঁওয়ায় যেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। পরশ-মনির ছোঁওয়া

লেগে ওর অন্তর-লোক সোনার রঙে রেঙে উঠেছিল। তার মনের ভূত সেই দিনই ম'রে গেল।

চান্‌ ভানুর বিয়ে হয়ে গেল। বর তার কেমন হ'ল, তা সে দেখতে পেলে না। দেখবার তার ইচ্ছাও ছিল না। বরও ক'নেকে দেখলে না ভয়ে— যদি তার ঘাড়ের জিন এসে তার ঘাড় মট্‌কে দেয়। ভাল ভাল গুণীর সন্ধানে বর সেই দিনই বেরিয়ে পড়ল।

চান্‌ ভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে আল্লা-রাখার বাপ মা ভাই সকলে আল্লা-রাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোট ছোট ক'রে চুল ছাঁটা, পরনে একখানা গামছা, হাতে পাঁচনী, কাঁধে লাঙ্গল। তার মা সব বুঝ্‌লে। তার ছেলে আর চান্‌ ভানুকে নিয়ে গ্রামে যা সব রটেছে, সে তার সব জানে। মা নীরবে চোখ মুছে ঘরে চলে গেল। তার বাপ আর ভাইরা খোদার কাছে আল্লা-রাখার এই সুমতির জন্য হাজার শোকর ভেজ্‌ল।...

দূরে হিজল গাছের তলায় আরো দুটি চোখ আল্লা-রাখার কৃষাণ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে সে-দিনকার প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতই বাষ্পাকুল হয়ে উঠ্‌ল—সে চোখ চান্‌ ভানুর। সে দৌড়ে গিয়ে আল্লা-রাখার পায়ের কাছে প'ড়ে কেঁদে উঠল, "কে তোমারে এমনডা করল?" আল্লা-রাখা শান্ত হাসি হেসে ব'লে উঠ্‌ল— "জিনের বাদ্‌শা।"

অগ্নি-গিরি

বীররামপুর গ্রামের আলি নসীব মিঞার সকল দিক দিয়েই আলি নসীব। বাড়ী, গাড়ী ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য। ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারী তিনি।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁঠাল-কোয়ার মত টক্‌টকে রং। আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।

তাঁকে একমাত্র দুঃখ দিয়েছে-নিমকহারাম দাঁত ও চুল। প্রথমটা গেছে প'ড়ে, দ্বিতীয়টার কতক গেছে উঠে, আর কতক গেছে পেকে। এই বয়সে এই দুর্ভোগের জন্য তাঁর আফ্‌সোসের আর অন্ত নেই। মাথায় চুলগুলোর অধঃপতন রক্ষা কর্‌বার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু কিছুতেই যখন তা রুখতে পারলেন না, তখন এই ব'লে সান্ত্বনা লাভ করলেন যে, সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডেরও টাক ছিল। তাঁর টাকের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন যে, টাক বড় লোকদের মাথাতেই পড়ে—কুলি-মজুরের মাথায় টাক পড়ে না। তা ছাড়া, হিসাব নিকেশ কর্‌বার জন্য নিকেশ মাথারই প্রয়োজন বেশী। কিন্তু টাকের এত সুপারিশ করলেও তিনি মাথা থেকে সহজে

টুপী নামাতে চাইতেন না। এ নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি বলতেন—টাক আর টাকা দুটোকেই লুকিয়ে রাখতে হয়, নৈলে লোকে বড় নজর দেয়। টাক না হয় লুকোলেন, সাদা চুল দাড়িকে ত লুকোবার আর উপায় নেই। আর উপায় থাকলেও তিনি আর তাতে রাজী নন্। একবার কলপ লাগিয়ে তাঁর মুখ এত ভীষণ ফু'লে গেছিল, এবং তার সাথে ডাক্তাররা এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল যে, সেই দিন থেকে তিনি তৌবা ক'রে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু, সাদা চুল-দাড়িতে এতটুকু তাঁর সৌন্দর্য হানি হয়নি। তাঁর গায়ের রং-এর সঙ্গে মিশে তাতে বরং তাঁর চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে। এক বুক শ্বেত শ্মশ্রু—যেন শ্বেত বালুচরে শ্বেত মরালী ডানা বিছিয়ে আছে।

এঁরই বাড়ীতে থেকে ত্রিশালের মাদ্রাসায় পড়ে—সবুর আখন্দ। নামেও সবুর, কাজেও সবুর। শান্তশিষ্ট গো-বেচারা মানুষটি। উনিশ-কুড়ির বেশী বয়স হবে না, গরীব শরীফ ঘরের ছেলে দেখে আলি নসীব মিঞা তাকে বাড়ীতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ যোগান।

ছেলেটি অতি মাত্রায় বিনায়াবনত। যাকে বলে—সাত চড়ে রা বেরোয় না। তার হাব-ভাব যেন সর্বদাই বল্‌ছে— "আই হ্যাভ্ দি অনার টু বি সার ইওর মোষ্ট্ ওবিডিয়েন্ট সার্‌ভেন্ট।"

আলি নসীব মিঞার পাড়ার ছেলেগুলি অতিমাত্রায় দুরন্ত। বেচারা সবুরকে নিয়ে দিনরাত তারা প্যাঁচা খ্যাঁচরা করে। পথে ঘাটে ঘরে বাইরে তারা সবুরকে সমানে হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জল ছিঁচে উত্যক্ত করে। ছেঁচা জল আর মিছে কথা নাকি গায়ে বড় লাগে—কিন্তু সবুর নীরবে এ সব নির্যাতন সয়ে যায়, এক দিনের তরেও বে-সবুর হয়নি।

পাড়ার দুরন্ত ছেলের দলের সর্দার রুস্তম। সে-ই নিত্য নতুন ফন্দি বের করে সবুরকে ক্ষ্যাপানোর। ছেলে মহলে সবুরের নাম প্যাঁচা মিয়া। তার কারণ, সবুর স্বভাবতঃই ভীরু নিরীহ ছেলে; ছেলেদের দলের এই অসহ্য জ্বালাতনের ভয়ে সে পারতপক্ষে তার এঁদো কুঠীর থেকে বাইরে আসে না। বেরুলেই প্যাঁচার পিছনে যেমন ক'রে কাক লাগে, তেমনি ক'রে ছেলেরা লেগে যায়।

সবুর রাগে না র'লে ছেলেদের দল ছেড়েও দেয় না। তাদের এই ক্ষ্যাপানোর নিত্য নুতন ফন্দি আবিষ্কার দেখে পাড়ার সকলে যে হেসে লুটিয়ে পড়ে, তাতেই তারা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।

পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। তাদের পাড়াতে কোনো মাদ্রাসার "তালবিলিম" (তালেবের এলম্ বা ছাত্র) জায়গীর থাক্‌ত না পাড়ার

ছেলেগুলির ভয়ে। সবুরের অসীম ধৈর্য্য। সে এমনি ক'রে তিনটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আর একটা বছর কাটিয়ে দিলেই তার মাদ্রসার পড়া শেষ হয়ে যায়।

সবুর বেরোলেই ছেলেরা আরম্ভ করে—"প্যাঁচারে, তুমি ডাহ! হুই প্যাঁচা মিঞাগো, একডিবার খ্যাচখ্যাচাও গো !" রুস্তম রুস্তমী কণ্ঠে গান ধরে—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়-
যাইতে যাইতে খ্যাচ্ খ্যাচায়।
ক্যাওয়ারা সব লইল পাছ,
প্যাঁচা গিয়া উঠল গাছ।
প্যাঁচার ভাইশ্‌তা কোলা ব্যাং
কইল চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচা কয়, বাপ বারিত্ যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়
বোচা নাকে ফ্যাচফ্যাচায়।

ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বেচারা সবুর তাড়াতাড়ি তার কুঠরিতে ঢুকে দোর লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে রুস্তম গায়—

প্যাঁচা, একবার খ্যাচ্‌খাচাও।
গর্ত থাইক্যা ফুচ্‌কি দাও।
মুচ্‌কি হাইস্যা কও কথা,
পাঁচারে মোর খাও মাথা।

সবুর কথা কয় না। নীরবে বই নিয়ে পড়তে বসে। যেন কিছুই হয়নি। রুস্তমী দলও নাছোড়বান্দা। আবার গায় —

মেকুরের ছাও মক্কা যায়,
প্যাঁচায় পড়ে, দেইখ্যা আয়।

হঠাৎ আলি নসীব মিঞাকে দেখে ছেলের দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আলি নসীব মিঞা রসিক লোক। তিনি ছেলেদের হাত থেকে সবুরকে বাঁচালেও না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেন না। হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ঢুকে দেখেন তাঁর একমাত্র সন্তান নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে নালিশ করছে—কেন পাড়ার ছেলেরা রোজ রোজ সবুরকে অমন ক'রে জ্বালিয়ে মারবে? তাদের কেউ ত সবুরকে খেতে দেয় না।

তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে রুস্তমী দল গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—

প্যাঁচা মিঞা কেতাব পড়ে
হাঁড়ি নড়ে দাড়ি নড়ে।

নূরজাহান রাগে তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার যত রাগ পঁড়ুল গিয়ে তার বাবার উপরে। তার বাবা ত ইচ্ছা কর্‌লেই ওদেরে ধমকে

দিতে পারেন। বেচারা সবুর গরীব, স্কুলে পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়ে—এই ত তার অপরাধ। মাদ্রাসায় না প'ড়ে সে যদি খানায় পড়ত ডোবায় পড়ত—তাতেই বা কার কি ক্ষতি হ'ত। কেন ওরা আদা-জল খেয়ে ওর পিছনে এমন ক'রে লাগ্‌বে ?

আলি নসীব মিঞা সব বুঝলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপ্‌তে পারলেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কি হইছেরে বেডি ? ছেমরাডা প্যাঁচার লাহান বাড়ীত্‌ বইয়া রইব, এক্‌ডা কথা কইব না, তাইনাসেন্‌ উয়ারে প্যাঁচা কয়।" নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, "আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেডার ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন! আমি পোলা অইলে এইদুন্‌ একচট্‌কনা দিতাম রুস্তম্যারে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে, ঐ হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎকা মাইর‍্যা। উইঠ্যা আর দানা-পানি খাইবার অইত না।" ব'লেই কেঁদে ফেল্‌লে।

আলি নসীব মিঞা মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "চুপ দে বেডি, এইবারে ইবলিশের পোলারা আইলে দাবার পাইর‍্যা লইয়া যাইব! মুন্‌শী বেডারে কইয়্যা দিবাম, হে ঐ রুস্তম্যারে ধইরা তার কান দুডা এক্কেরে মুত্যা কইরা কাইট্যা হালাইবো।"

নূরজাহান অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি উ'ঠে বল্‌ল, " আব্বাজান, চা খাইবেন নি ?"

আলী নসীব মিঞা হেসে ফেলে বললেন, "বেডির বুঝি য়্যাহন চাহের কথা মনে পরল।"

নূরজাহান আলি নসীব মিঞার একমাত্র সন্তান ব'লে অতি মাত্রায় আদু'রে মেয়ে। বয়স পনের পেরিয়ে গেছে। অথচ মেয়ের বিয়ে দেবার নাম নেই বাপ-মায়ের। কথা উঠ্‌লে বলেন, মনের মত জামাই না পেলে বিয়ে দেওয়া যায় কি করে! মেয়েকে ত হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া যায় না। আসল কথা তা নয়। নূরজাহানের বাপ-মা ভাবতেই পারেন না, ওঁদের ঘরের আলো নূরজাহান অন্য ঘরে চলে গেলে তাঁরা এই আঁধার পুরীতে থাকবেন কি ক'রে! নৈলে এত ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর বরের অভাব হয় না। সম্বন্ধও যে আসে না, এমনও নয়; কিন্তু আলি নসীব মিঞা এমন উদাসীনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, তা'রা আর বেশী দূর না এগিয়ে সরে পড়ে।

নূরজাহান বাড়ীতে থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। এখন সবুরের কাছে উর্দু পড়ে। শরীফ ঘরের এত বড় মেয়েকে অনাত্মীয় যুবকের কাছে প'ড়তে দেওয়া দূরের কথা, কাছেই আসতে দেয় না বাপ মা; কিন্তু এদিক দিয়ে সবুরের এতই সুনাম ছিল যে, সে নূরজাহানকে পড়ায় জেনেও কোনো লোক এতটুকু কথা উথাপন করেনি।

সবুর যতক্ষণ নূরজাহানকে পড়ায় ততক্ষণ একভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে থাকে, একটিবারও নূরজাহানের মুখের দিকে ফিরে তাকায় না। বাড়ী ঢোকে মাথা নীচু ক'রে, বেরিয়ে যায় মাথা নীচু ক'রে। নূরজাহান, তার বাবা মা সকলে প্রথম প্রথম হাস্‌ত—এখন সয়ে গেছে।

সত্যসত্যই, এই তিন বছর সবুর এই বাড়ীতে আছে, এর মধ্যে সে একদিনের জন্যও নূরজাহানের হাত আর পা ছাড়া মুখ দেখেনি।

এ নূরজাহান জাহানের জ্যোতি না হ'লেও বীররামপুরের জ্যোতি, জোহরা সেতারা, এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই। নূরজাহানের নিজেরও যথেষ্ট গর্ব আছে, মনে মনে তার রূপের সম্বন্ধে।

আগে হ'ত না— এখন কিন্তু নূরজাহানের সে অহঙ্কারে আঘাত লাগে—দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার রূপের কি তা হ'লে কোনো আকর্ষণই নেই ? আজ তিন বছর সে সবুরের কাছে পড়ছে-এত কাছে তবু সে একদিন মুখ তুলে তাকে দেখ্‌ল না ? সবুর তাকে ভালোবাসুক—এমন কথা সে ভাবতেই পারে না,— কিন্তু ভালো না বাস্‌লেও যার রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে—যাকে একটু দেখতে পেলে অন্য যে কোনো যুবক জন্মের জন্য ধন্য হয়ে যায়—তাকে একটিবার একটুক্ষণের জন্যেও চেয়ে দেখ্‌ল না ! তার সতীত্ব কি নারীর সতীত্বের চেয়েও ঠুনকো ?

ভাবতে ভাবতে সবুরের উপর তার আক্রোশ বেড়ে ওঠে, মন বিষিয়ে যায়, ভাবে আর তার কাছে পড়বে না। কিন্তু যখন দেখে—নির্দোষী নির্বিরোধী নিরীহ সবুরের উপর রুস্তমী দল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাক্‌তে পারে না। আহা, বেচারার হয়ে কথা কইবার যে কেউ নেই। সে নিজেও যে একটিবার মুখ ফু'টে প্রতিবাদ করে না ? এ কি পুরুষ মানুষ বাবা ! মার, কাট, মুখ দিয়ে কথাটি নেই ! এমন মানুষও থাকে দুনিয়াতে !

যত সে এইসব কথা ভাবতে থাকে, তত এই অসহায় মানুষটির ওপর করুণায় নূরজাহানের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে।

সবুর পুরুষ বলতে যে মর্দ-মিনসে বোঝায়-তা ত নয়ই, সুপুরুষও নয়। শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। রূপের মধ্যে তার চোখ দু'টি। যেন দুটি ভীরু পাখী। একবার চেয়েই অমনি নত হয়ে পড়ে। সে চোখ, তার চাউনি—যেমন ভীরু, তেমনি করুণ, তেমনি অপূর্ব সুন্দর ! পুরুষের অত বড় অতি সুন্দর চোখ সহজে চোখে পড়ে না।

এই তিন বছর সে এই বাড়ীতে আছে, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা না করলে সে অন্য লোক ত দূরের কথা— এই বাড়ীরই কারুর সাথে কথা কয় নি। নামাজ পড়ে, কোরান তেলাওত করে, মাদ্রাসা যায়, আসে, পড়ে কিম্বা

ঘুমোয়— এই তার কাজ। কোনো দিন যদি ভুলক্রমে ভিতর থেকে খাবার না আসে, সে না খেয়েই মাদ্রাসা চ'লে যায়—চেয়ে খায় না। পেট না ভরলেও দ্বিতীয় বার খাবার চেয়ে নেয় না। তেষ্টা পেলে পুকুর-ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে আসে, বাড়ীর লোকের কাছে চায় না।....

সবুর এত অসহায় বলেই নূরজাহানের অন্তরের সমস্ত মমতা সমস্ত করুণা ওকে সদাসর্বদা ঘিরে থাকে। সে না থাক্‌লে, বোধ হয় সবুরের খাওয়াই হ'ত না সময়ে। কিন্তু নূরজাহানের এত যে যত্ন, এত যে মমতা, এর বিনিময়ে সবুর এতটুকু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েও তাকে দেখেনি, কিছু বলা ত দূরের কথা। মারলে-কাট্‌লেও অভিযোগ করে না, সোনা-দানা দিলেও কথা কয় না।

।।২।।

সেদিন আলি নসীব মিঞার বাড়ীতে একজন জবরদস্ত পশ্চিমে মৌলবী সাহেব এসেছেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ ও ওয়াজ-নসীহৎ হবে। মৌলবী সাহেবের সেবা-যত্নের ভার পড়েছে সবুরের উপর। বেচারা জীবনে এত বেশী বিব্রত হয়নি। কি করে, সে তার সাধ্যমত মৌলবী সাহেবের খেদমত করতে লাগ্‌ল।

সবুরকে বাইরে বেরুতে দেখে রুস্তমী দলের একটি দুটি করে ছেলে এসে জুটতে লাগ্‌ল। তাদের দেখে সবুর বেচারার, ভাসুরকে দেখে ভাদ্র-বউর যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হ'ল।

মৌলবী সাহেবের পাগড়ির ওজন কত, দাড়ির ওজন কত, শরীরটাই বা কয়টা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না, তার গোঁফ উই-এ না ইঁদুরে খেয়েছে— এইসব গবেষণা নিয়েই রুস্তমী দল মত্ত ছিল; রুস্তম তখনো এসে পৌঁছেনি ব'লে সবুরকে জ্বালাতন করা শুরু করেনি।

হঠাৎ মৌলবী সাহেব বিশুদ্ধ উর্দুতে সবুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি করে। সবুর বিনীতভাবে বল্‌লে সে তালেবে এল্‌ম বা ছাত্র। আর যায় কোথায়। ইউসোফ ব'লে উঠল, প্যাঁচা মিঞা কি কইল, রে ফজল্যা ?" ফজল হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, "প্যাঁচা মিঞা কইল, মুই তাল্‌বিলিম।" ততক্ষণে রুস্তম এসে পড়েছে। সে ফজলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠ্‌ল, "কেডা তালবিল্লি! প্যাঁচা মিঞা?" ছেলেরা হাস্‌তে হাস্‌তে শুয়ে পড়ে রোলারের মত গড়াতে লাগ্‌ল! "হয়! রুস্তম্যা জোর কইছে রে ! তালবিল্লি ! — উরে বাপ্‌রে! ইল্লারে বিল্লা! তালবিল্লি -হি হি হি হা হা হা!" বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে। কস্তা-পে'ড়ে হাসি।

বেচারা সবুর ততক্ষণে মৌলবী সাহেবের সেবা-টেবা ফেলে তার কামরায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে। রুস্তম সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে গাইতে লাগ্‌ল—

প্যাঁচা অইলো তালবিল্লি,
দেওবন্দ, যাইয়া যাইবো দিল্লী।
আইয়া করবো চিল্লাচিল্লি—
কুত্তার ছাও আর ইল্লিবিল্লি!

মৌলবী সাহেব আর থাক্‌তে পারলেন না। আস্তিন গুটিয়ে ছেলেদের তাড়া করে এলেন। ছেলেরা তাঁর বিশিষ্টরূপে শালের মত বিশাল দেহ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে গেয়ে গেল—

উলু আয়া লাহোর সে
আজ পড়েগা আলেফ বে!

মৌলবী সাহেব বিশুদ্ধ উর্দু ছেড়ে দিয়ে ঠেট্ হিন্দিতে ছেলেদের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলেন।

আলি নসীব মিঞা সব শূনে ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। আজ মৌলবী সাহেবের সামনে তাদের বেশ করে উত্তম-মাধ্যম দেবেন। কিন্তু ছেলেদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছেলেরা ততক্ষণে তিন চার মাইল দূরে এক বিলের ধারে ব্যাং সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৌলবী সাহেব তাদের তাড়া করায়, তারা বেজায় চটে গিয়ে ঠিক করেছে— আজ মৌলবী সাহেবের ওয়াজ্ পণ্ড করতে হবে। স্থির হয়েছে, যখন বেশ জ'মে আস্‌বে ওয়াজ, তখন একজন ছেলে একটা ব্যাং-এর পেট এমন করে টিপবে যে ব্যাংটা ঠিক সাপে ধরা ব্যাং-এর মত করে চ্যাঁচাবে; ততক্ষণ আর একজন একটা ব্যাং মজলিশের মাঝখানে ছেড়ে দেবে, সেটা যখন লাফাতে থাকবে—তখন অন্য একজন ছেলে চীৎকার করে উঠবে—সাপ! সাপ!

ব্যস্ ! তাইলেই ওয়াজের দফা ঐখানেই ইতি!

বহু চেষ্টার পর গোটা কত ব্যাং ধরে নিয়ে যে যার বাড়ী ফিরল।

আলি নসীব মিঞার বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বারী ব'লে উঠল, 'রুস্তম্যা রে, হালার তালবিল্লি পায়খানায় গিয়াছে। বদনাটা উডাইয়া লইয়া আইমু ?"

রুস্তম খুশী হয়ে তখনি হুকুম দিল। বারী আস্তে আস্তে বদনাটি উঠিয়ে এনে পুকুর-ঘাটে রেখে দিয়ে এল।

একঘন্টা গেল, দু'ঘন্টা গেল, সবুর যেমন অবস্থায় গিয়ে বসেছিল তেমনি অবস্থায় বসে রইল পায়খানায়!। বেরও হয় না, কাউকে দিয়ে বদনাও চায় না। দূরে আলি নসীব মিঞাকে দেখে ছেলের দল যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।

আলি নসীব মিঞা ভাবলেন, নিশ্চয় সবুরের কিছু একটা করছে পাজী ছেলের দল। কিন্তু এসে সবুরকে দেখতে না পেয়ে বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা

করলেন, তারাও কিছু জানে না বললে। ছেলের দল হল্লা করছিল "তালবিল্লি" ব'লে—এইটুকুই তারা জানে।

আরো দুই ঘন্টা অনুসন্ধানের পর সবুরের সন্ধান পাওয়া গেল। সবুর সব বললে। কিন্তু তাতে উলটো ফল হল। আলি নসীব মিঞা তাকেই বক্‌তে লাগলেন— সে কেন বেরিয়ে এসে কারুর কাছে বদনা চাইলে না। এ ব্যাপার শুনে নূরজাহান রাগ করার চেয়ে হাস্‌লেই বেশী। এমনও সোজা মানুষ হয়!

আর একদিন সে হেসেছিল সবুরের দুর্দশায়। সবুর একদিন চুল কাটাচ্ছিল। রুস্তম তা দেখতে পেয়ে পিছন থেকে নাপিতকে ইশারায় একটা টাকার লোভ দেখিয়ে মাঝখানে টিকি রেখে দিতে বলে। সুশীল নাপিতও তা পালন করে। চুল কেটে স্নান করে সবুর যখন বাড়ীতে খেতে গেছে, তখন নূরজাহানের চোখে পড়ে প্রথম সে দৃশ্য। নূরজাহানের হাসিতে যে ব্যথা পেয়েছিল সবুর, তা সেদিন ও নূরজাহানের চোখ এড়ায়নি।

আজ আবার হেসে ফেলেই নূরজাহানের মন ব্যথিত হয়ে উঠল সবুরের সেই দিনের মুখ স্মরণ ক'রে। কি জানি কেন, তার চোখ জলে ভ'রে উঠল।...

সন্ধ্যায় যখন মৌলবী সাহেব ওয়াজ করছেন, এবং ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর কথা যত বুঝ্‌তে না পারছে, তত ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠ্‌ছে— তখন সহসা মজলিশের এক কোণায় অসহায় ভেকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল। শ্রোতৃবৃন্দ চমকিত হয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল, রক্তাক্ত কলেবর বুঝিবা সেই ভেক-প্রবরই উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথার উপর দিয়ে হাউণ্ড রেস আরম্ভ ক'রে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠল— "সাপ! সাপ!"

আর বলতে হ'ল না। নিমিষে যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল। মৌলবী সাহেব তক্তাপোষে উঠে পড়ে তাঁর জাব্বা-জোব্বা ঝাড়তে লাগলেন। আর ওয়াজ হ'ল না সেদিন।...

মৌলবী সাহেব যখন খেতে বসেছেন, তখন অদূরে গান শোনা গেল—

"উলু ! বোলো" কহে সাপ
উলু বোলে—"বাপ্ রে বাপ!"
"কাল নসীহত হোগা ফের ?"
উলু বোলে— কের্ কের্ কের!
লে উঠা লোটা কম্বল
উলু! আপনা ওতন্ চল!

সহসা মৌলবী সাহেবের গলায় মুগীর ঠ্যাং আট্‌কে গেল। আলি নসীব মিঞা নিস্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে লাগলেন।

।।৩।।

সেদিন রাস্তা দিয়ে গফরগাঁও-এর জমিদারদের হাতী যাচ্ছিল। নুরজাহান বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বেচারা সবুরও হাতী দেখার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অদূরে সদল বলে রুস্তম দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাতীটার দিকে দেখিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, "এরিও তালবিল্লি মিঞা গো ! হুই তোমাগ বাছুরড়া আইতেছে, ধইরা লইয়াও।" রাস্তার সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। রাস্তার একটা মেয়ে বলে উঠল, "বিজাত্যার পোলাডা। হাতীটা বাছুর না, বাছুর তুই।" ভাগ্যিস রুস্তম শুনতে পায়নি।

নূরজাহান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে যত না রাগ্‌ল ছেলেগুলোর উপর, তার অধিক রেগে উঠল সবুরের উপর। সে প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে, আজ তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। এই কি পুরুষ! মেয়েছেলেও অধম যে!

সেদিন সন্ধ্যায় যখন পড়াতে গেল সবুর, তখন কোনো ভূমিকা না ক'রে নূরজাহান ব'লে উঠল, "আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন ? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না ?"

সবুর আজ যেন ভুলেই তার ব্যথিত চোখ দুটি নূরজাহানে মুখের উপর তুলে ধরল! কিন্তু চোখ তুলে যে রূপ সে দেখলে, তাতে তার ব্যথা লজ্জা অপমান সব ভূলে গেল সে ! দুই চোখে তার অসীম বিস্ময় অনন্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। এই তুমি। সহসা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল-"নূরজাহান।"

নূরজাহানও বিস্ময়-বিমূঢ়ার মত তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। এ কোন্ বনের ভীরু হরিণ ? অমন হরিণ-চোখ যার, সে কি ভীরু না হয়ে পারে? নূরজাহান কখনো সবুরকে চোখ তুলে চাইতে দেখেনি। সে রাস্তা চল্‌ত কথা কইত—সব সময় চোখ নিচু করে। মানুষের চোখ যে মানুষকে এত সুন্দর করে তুলতে পারে— তা আজ সে প্রথম দেখল।

সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেলল।

আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ঝড় উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয়, সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নি-গিরি।

সবুরের চোখে মুখে পৌরুষের প্রখর দীপ্তি ফুটে উঠল। সে নূরজাহানের দিকে দীপ্ত চোখে চেয়ে ব'লে উঠল, "ঐ পোলাপানের যদি জওয়াব দিই, তুমি খুশী হও?" নূরহাজানও চকচকে চোখ তুলে ব'লে উঠল, "কে জওয়াব দিবো? আপনি?"

এ মৃদু বিদ্রূপের উত্তর না দিয়ে সবুর তার দীর্ঘায়ত চোখ দুটির জ্বলন্ত ছাপ নূরজাহানের বুকে বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। নূরজাহান আত্ম-বিস্মৃতের মত

সেইখানে ব'সে রইল। তার দুটি সুন্দর চোখ আর তদধিক সুন্দর চাউনি ছাড়া আর কোনো কিছু মনে রইল না! যে সবুরকে কেউ কখনো চোখ তু'লে চাইতে দেখেনি, আজ সে উজ্জ্বল চোখে, দৃপ্তপদে রাস্তায় পায়চারী করছে দেখে সকলে অবাক হয়ে উঠল।

রুস্তমীদল গাঙের পার থেকে বেড়িয়ে সেই পথে ফিরছিল। হঠাৎ ফজল চীৎকার করে উঠল—"উইরে তালবিল্লি!"

সবুর ভাল করে আস্তিন গুটিয়ে নিল।

বারী পিছু দিক থেকে সবুরের মাথায় ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "প্যাঁচারে, তুমি ডাহ।"

সবুর কিছু না বলে এমন জোরে বারীর এক গালে থাপ্‌পড় বসিয়ে দিলে যে, সে সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল। সবুরের এ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে দলের সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সবুর কথাটি না বলে গম্ভীরভাবে বাড়ীর দিকে যেতে লাগ্‌ল। বারী ততক্ষণে উ'ঠে বসেছে! উঠেই সে চীৎকার করে উঠল—"সে হালায় গেল কোই?"

বলতেই সকলের যেন হুঁস ফিরে এল। মার্‌ মার্‌ ক'রে সকলে গিয়ে সবুরকে আক্রমণ করলে সবুরও অসম সাহসে তাদেরে প্রতি-আক্রমণ করলে। সবুরের গায়ে যে এত শক্তি, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সে রুস্তমীদলের এক এক জনের টুঁটি ধ'রে পাশের পুকুরের জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌ল।

আলি নসীব মিঞার এউ পুকুরটা নতুন কাটানো হয়েছিল, আর তার মাটিও ছিল অত্যন্ত পিছল। কাজেই যারা পুকুরে পড়তে লাগল গড়িয়ে—তারা বহু চেষ্টাতেও পুকুরের অত্যুচ্চ পাড় বেয়ে সহজে উঠতে পারল না। পা পিছলে বারে বারে জলে পড়তে লাগল গিয়ে। এইরূপে যখন দলের পাঁচ ছয় জন, মায় রুস্তম সর্দার জলে গিয়ে পড়েছে—তখন রুস্তমীদলের আমীর তার পকেট থেকে দুফলা ছুরিটা বের ক'রে সবুরকে আক্রমণ করল। ভাগ্যক্রমে প্রথম ছুরির আঘাত সবুরের বুকে না লেগে হাতে গিয়ে লাগল। সবুর প্রাণপণে আমীরের হাত মুচড়ে ধরতেই সে ছুরি সমেত উল্টে পড়ে গেল এবং আমীরের হাতের ছুরি আমীরেরই বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল! আমীর একবার মাত্র "উঃ' বলেই অচৈতন্য হয়ে গেল! বাকী যারা যুদ্ধ করছিল—তারা পাড়ায় গিয়ে খরব দিতেই পাড়ার লোক ছুটে এল। আলি নসীব মিঞাও এলেন।

সবুর ততক্ষণে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমীরকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুকের ছুরিটা তুলে ফেলে সেই ক্ষতমুখে হাত চেপে ধরেছে। আর তার হাত বেয়ে ফিনিক দিয়ে রক্ত-ধারা ছুটে চলেছে!

আলি নসীব মিঞা তাঁর চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁর চক্ষু ঢেকে ফেল্‌লেন।

একটু পরে ডাক্তার এবং পুলিশ দু-ই এল। আমীরকে নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়, সবুরকে নিয়ে গেল থানায়।

সবুরকে থানায় নিয়ে যাবার আগে দারোগাবাবু আলি নসীব মিঞার অনুরোধে তাকে একবার তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সে দারোগাবাবুর কাছে একটুও অতিরঞ্জিত না ক'রে সমস্ত কথা খু'লে বল্‌লে। তার কথা অবিশ্বাস করতে কারুরই প্রবৃত্তি হ'ল ন। দারোগাবাবু বললেন, "কেস খুব সিরিয়াস নয়, ছেলেটা বেঁচে যাবে! এ কেস আপনারা আপোষে মিটিয়ে ফেলুন সাহেব।"

আলি নসীব মিঞা বললেন, "আমার কোনো আপত্তি নাই দারোগা সাহেব, আমীরের বাপে কি কেস মিটাইব? তারে ত আপনি জানেন। যারে কয় এক্কেরে বাঙাল!'

দারোগাবাবু বললেন, "দেখা যাক, এখন ত ওকে থানায় নিয়ে যাই। কি করি, আমাদের কর্তব্য করতেই হবে।"

ততক্ষণে আলি নসীব মিঞার বাড়ীতে কান্নাকাটি প'ড়ে গেছে। এই খবর শুনেই নূরজাহান মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল। আলি নসীব মিঞা যখন সবুরকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন নূরজাহান একেবারে প্রায় সবুরের পায়ের কাছে প'ড়ে কেঁদে উঠল, "কে তোমারে এমনডা করবার কইছিল? কেন এমনডা করলে?"

নূরজাহানের মা সবুরকে তার গুণের জন্য ছেলের মতই মনে করতেন। তা ছাড়া, তাঁর পুত্র না হওয়ায় পুত্রের প্রতি সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ গোপনে সবুরকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি সবুরের মাথাটা বুকের উপর চেপে ধ'রে কেঁদে আলি নসীব মিঞাকে বললেন, "আমার পোলা এ, আমি দশ হাজার ট্যাহা দিবাম, দারোগাব্যাডারে কন, হে এরে ছ্যাইরা দিয়া যাক্‌।"

সবুর তার রক্তমাখা হাত দিয়ে নূরজাহানকে তু'লে ব'লে উঠল, "আমি যাইতেছি ভাই। যাইবার আগে দেহাইয়া গেলাম— আমিও মানুষের পোলা। এ যদি না দেহাইতাম, তুমি আমায় ঘৃণা করত্যা। খোদায় তোমায় সুখে রাখুন!" ব'লেই তার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বল্‌লে, "আম্মাগো এই তিনডা বছরে আপনি আমায় আমার মায়ের শোক ভুলাইছিলেন।" আর সে বল্‌তে পারল না— কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আলি নসীব মিঞার পদধুলি নিয়ে সে নির্বিকারচিত্তে থানায় চ'লে গেল। দারোগাবাবু কিছুতেই জামীন দিতে রাজী হলেন না। দশ হাজার টাকার বিনিময়েও না, খুনী আসামীকে ছেড়ে দিলে তাঁর চাকরি যাবে।

নূরজাহানের কানে কেবল ধ্বনিত হ'তে লাগল "তুমি আমায় ঘৃণা করতে।" তার ঘৃণায় সবুরের কি আস্‌ত যেত? কেন সে তাকে খুশী করবার জন্য এমন ক'রে "মরিয়া হইয়া" উঠল? সে যদি আজ এমন ক'রে না বল্‌ত

সবুরকে, তা হ'লে কখনই সে এমন কাজ করত না। এমন নির্যাতন ত সে তিন বছর ধরে সয়ে আসছে। তারই জন্য আজ সে থানায় গেল! দুদিন পরে হয়ত তার জেল, দ্বীপান্তর—হয়ত বা তার চেয়ে বেশী—ফাঁসি হয়ে যাবে! "উঃ" ব'লে আর্তনাদ ক'রে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

আলি নসীব মিঞা যেন আজ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। আজ সবুর তার দুঃখ দিয়ে তাঁর সুখের বাকী দিনগুলোকেও মেঘাচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে গেল! একবার মনে হ'ল, বুঝি বা দুধ-কলা দিয়ে তিনি সাপ পুষেছিলেন! পরক্ষণেই মনে হ'ল সে সাপ নয়, সাপ নয়! ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক! আর-যদি সাপই হয়—তা হ'লেও ওর মাথায় মণি আছে! ও জাত-সাপ!

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, তাঁর অনুকম্পায় প্রতিপালিত হ'লেও বংশমর্যাদায় সবুর তাঁদের চেয়েও অনেক উঁচে। আজ সে দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন, নিঃসহায়—কিন্তু একদিন এদেরি বাড়ীতে আলি নসীব মিঞার পূর্বপুরুষেরা নওকরী ক'রেছেন। তা ছাড়া এই তিন বছর তিনি সবুরকে যে অন্ন বস্ত্র দিয়েছেন তার বিনিময়ে সে তা'র কন্যাকে উর্দু ও ফার্সিতে যে কোন মাদ্রাসার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী ক'রে দিয়ে গেছে। আলি নসীব মিঞা নিজে মাদ্রাসা-পাশ হলেও মেয়ের কাছে তাঁর উর্দু ফার্সি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে ভয় হয়। সে ত এতটুকু ঋণ রেখে যায় নাই। শ্রদ্ধায় প্রীতিতে পুত্রস্নেহে তাঁর বুক ভ'রে উঠল!... যেমন ক'রে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে!

নিজের জন্য নয়, নিজের চেয়েও প্রিয় ঐ কন্যার জন্য! আজ ত আর তাঁর মেয়ের মন বুঝতে আর বাকী নেই। অন্যের ঘরে পাঠাবার ভয়ে মেয়ের বিয়ের নামে শিউরে উঠেছেন এতদিন, আজ যদি এই ছেলের হাতে মেয়েকে দেওয়া যায়—মেয়ে সুখী হবে, তাকে পাঠাতেও হবে না অন্য ঘরে। সে-ই ত ঘরের ছেলে হয়ে থাকবে। উচ্চশিক্ষা? মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা ত সে দিয়েইছে— পাসও করবে সে হয়ত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে। তারপর কলেজে ভর্তি ক'রে দিলেই হবে।

এই ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা ক'রে--আলি নসীব মিঞা অনেকটা শান্ত হলেন এবং মেয়েকেও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সে রাত্রে নূরজাহানের আর মূর্ছা হ'ল না, সে ঘুমাতেও পারল না। সমস্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল— সেই দুটি চোখ, দুটি তারার মত! প্রভাতী তারা আর সন্ধ্যাতারা।

।।৪।।

আমীরকে বাঁচানো গেল না মৃত্যুর হাত থেকে-সবুরকে বাঁচানো গেল না জেলের হাত থেকে।

ময়মনসিংহের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই তার মৃত্যু হ'ল। আমীরের পিতা কিছুতেই মিটমাট করতে রাজী হলেন না। তিনি এই বলে নালিশ করলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল নূরজাহানের সাথে আমীরের বিয়ে দেন, আর তা জান্‌তে পেরেই সবুর তাকে হত্যা করেছে। তার কারণ, সবুরের সাথে নূরজাহানের গুপ্ত প্রণয় আছে। প্রামণ স্বরূপ তিনি বহু সাক্ষী নিয়ে এলেন—যারা ঐ দুর্ঘটনার দিন নূরজাহানকে সবুরের পা ধ'রে কাঁদতে দেখেছে! তা ছাড়া সবুর পড়াবার নাম ক'রে নূরজাহানের সাথে মিলবার যথেষ্ট সুযোগ পেত!

নূরজাহান আর আলি নসীব মিঞা একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। দেশময় ঢি ঢি প'ড়ে গেল। অধিকাংশ লোকেই একথা বিশ্বাস করল।

আলি নসীব মিঞা চেষ্টা ক'রেও সবুরকে উকিল দেওয়ার জন্য রাজী করতে পারলেন না। সে কোর্টে বল্‌লে, সে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে— উকিল বা সাক্ষী কিছুই দিতে চায় না সে। আলি নসীব মিঞা টাকার লোভে বহু উকিল সাধ্য-সাধনা ক'রেও সবুরকে টলাতে পারল না। আলি নসীব মিঞা তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে তাকে জেলে দেখা ক'রে শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও সফলকাম হয় নি। নূরজাহানের অনুরোধে সে বলেছিল, অনেক ক্ষতিই তোমাদের ক'রে গেলাম—তার উপরে তোমাদের আরো আর্থিক ক্ষতি ক'রে আমার বোঝা ভারী ক'রে তুলতে চাইনে। আমায় ক্ষমা ক'রো নূরজাহান, আমি তোমাদের আমার কথা ভুলতে দিতে চাইনে ব'লেই এই দয়াটুকু চাই!

সে সেশনে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক অকপটে ব'লে গেল। জজ সব কথা বিশ্বাস করলেন। জুরিরা বিশ্বাস করলেন না। সবুর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। আপীল করল না। সকলে বল্‌লে, আপীল করলে সে মুক্তি পাবেই। তার উত্তরে সবুর হেসে বলেছিল যে, সে মুক্তি চায় না— আমীরের যেটুকু রক্ত তার হাতে লেগেছিল—তা ধুয়ে ফেল্‌তে সাতটা বছরেও যদি সে পারে—সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

জজ তাঁর রায়ে লিখেছিলেন, আর কাউকে দণ্ড দিতে এত ব্যথা তিনি পাননি জীবনে।

যেদিন বিচার শেষ হয়ে গেল, সেদিন সপরিবারে আলি নসীব মিঞা ময়মনসিংহে ছিলেন।

নূরজাহান তার বাবাকে সেই দিনই ধরে বসলে,— তারা সকলে মক্কা যাবে। আলি নসীব মিঞা বহুদিন থেকে হজ করতে যাবেন ব'লে মনে ক'রে রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে বলতেনও সে কথা। নানান্ কাজে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি, মেয়ের কথায় তিনি যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। অত্যন্ত খুশী হয়ে ব'লে উঠলেন, "ঠিক কইছস বেডি, চল্ আমরা মক্কায় গিয়াই এ সাতটা

বছর কাটাইয়া দিই। এ পাপ-পুরীতে আর থাক্‌তাম না! আর আল্লায় যদি বাঁচাইয়া রাহে, ব্যাডা তালবিল্লিরে কইয়া যাইবাম, হে যেন একডিবার আমাদের দেখা দিয়া আইয়ে।" "বেডা তালবিল্লি" ব'লেই হো হো করে পাগলের মত হেসে উঠেই আলি নসীব মিঞা পরক্ষণে শিশুর মত ঢুকরে কেঁদে উঠলেন!

নূরহাজানের মা প্রতিবাদ করলেন না। তিনি জানতেন, মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে, তাতে তার বিয়ে আর এ দেশে দেওয়া চলবে না। আর, এ মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়ে এদেশে থাকাও চলে না।

ঠিক হ'ল একেবারে সব ঠিকঠাক ক'রে জমি-জায়গা বিক্রি ক'রে শুধু নগদ টাকা নিয়ে চ'লে যাবেন। আলি নসীব মিঞা সেই দিনই স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে দেখা ক'রে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে এলেন। কথা হ'ল ব্যাঙ্কই এখন টাকা দেবে, পরে তারা সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তুলে নেবে।

তার পরদিন সকলে জেলে গিয়ে সবুরের সাথে দেখা করলেন। সবুর সব শুন্‌ল। তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। জেলের জামার হাতায় তা মুছে বল্‌লে, "আব্বা, আম্মা, আমি সাত বছর পরে যাইবাম আপনাদের কাছে— কথা দিতাছি।"

তারপর নূরজাহানের দিকে ফিরে বল্‌লে, "আল্লায় যদি এই দুনিয়ায় দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম।" অশ্রুতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল, আর সে বল্‌তে পারলে না। নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে সবুরের পায়ের ধূলা নিতে গিয়ে তার দু' ফোঁটা অশ্রু সবুরের পায়ে গড়িয়ে পড়ল! বলল, "তাই দোওয়া কর।"

কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল—সেই দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের মনে হল—তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল!

শিউলি-মালা

।।১।।

মিস্টার আজ্‌হার কল্‌কাতায় নাম-করা তরুণ ব্যারিস্টার।

বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরানীতে বাড়ী তার হর্দম সরগরম্‌।

কিন্তু বাড়ীর আসল শোভাই নাই। মিস্টার আজ্‌হার অবিবাহিত ।

নাম-করা ব্যারিস্টার হ'লেও আজ্‌হার সহজে বেশী কেস্‌ নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও এক রকম চাল।

কিন্তু কল্‌কাতার দাবা'ড়েরা জানে, যে, মিস্টার আজ্‌হারের চাল যদি থাকে—ত সে দাবার চাল।

দাবা-খেলায় তাকে আজো কেউ হারাতে পারেনি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতেই মিস্টার আজ্‌হারকে বড় ব্যারিস্টার হ'তে দেয়নি, কিন্তু বড় মানুষ ক'রে রেখেছে।

বড় ব্যারিস্টার যখন "উইকলি নোট্‌স" পড়েন আজ্‌হার তখন অ্যালেখিন, ক্যাপাব্লাঙ্কা কিম্বা রুবিন্‌স্টাইন, রেটি, মরফির খেলা নিয়ে ভাবে, কিম্বা চেস-ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুঁজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে আর হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কল্‌কাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবা'ড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলে, খেলা নিয়ে আলোচনা করে।

আজ্‌হারের সবচেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মত খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল। অথচ এই অ্যালেখিনই বোগোল-জুবোর মত খোলোয়াড়ের কাছে অন্ততঃ পাঁচ পাঁচবার হেরে যায় !

মিস্টার মুখার্জী অ্যালেখিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিস্টার আজ্‌হার নিত্যকার মত একবার ঐ কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে, মিস্টার মুখার্জী ব'লে উঠলো—"কিন্তু তুই যাই বল আজ্‌হার, অ্যালেখিনের ডিফেন্স-ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালেখিনের কাছে তিন-পাঁচে পনের বার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু'চার বাজি সমস্ত ওয়ালর্ড-চ্যাম্পিয়ান হেরে থাকেন। চব্বিশ দান খেলায় পাঁচদান জিতেছে। তা ছাড়া, বোগোল-জুবোও ত যে সে খেলোয়াড় নয়!"

আজ্‌হার হেসে ব'লে উঠ্‌ল, "আরে রাখ তোমার অ্যালেখিন। এইবার ক্যাপাব্লাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালেখিনের দুর্দশা! আর বোগোল জুবোকে ত সেদিনও ইটালিয়ান মন্টিসেলি বগল-দাবা করে দিলে! হাঁ, খেলে বটে গ্রান্‌ফেল্‌ড্‌।"

বন্ধুদের মধ্যে একজন চটে গিয়ে বললে, "তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম নেই? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ড, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম— জ্বালালে বাবা।"

মুখার্জী হেসে বল্‌ল,"তুমি ত বেশ গ্রাবু খেলতে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চ'লে যাওনা স্ত্রীর বোনদের বাড়ীতে! এ দাবার চাল তোমার মাথায় ঢুকবে না!"

তরুণ উকিল নাজিম হাই তু'লে তুড়ি দিয়ে ব'লে উঠলে, "ও জিনিস মাথায় না ঢুকাতে বেঁচে গেছি বাবা! তার চেয়ে আজ্‌হার সাহেব দুটো গান

শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তারপর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে ব'স।"

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিক্‌ল না। আজ্‌হারকে গাইতে হ'ল। আজ্‌হার চমৎকার ঠুংরী গায়। বিশুদ্ধ লক্ষ্ণৌ ঢং-এর অজস্র ঠুংরী গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, যে শুন্‌ত, সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলি গজল গাইতে লাগল।

আজ্‌হার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জী হেসে ব'লে উঠল,—"আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে? কেবল গজল গাচ্ছ, মানে কি? রংঢং ধরেছে নাকি কোথাও?"

আজ্‌হারও হেসে বল্‌লে, "বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।"

এতক্ষণে যেন সকলের বাইরের দিকে নজর পড়্‌ল। একটু আগের বর্ষা-ধোওয়া ছলছলে আকাশ। যেন একটি বিরাট নীল পদ্ম। তারির মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি । চারপাশে তারা যেন আলোক-ভ্রমর।

লেক-রোডের পাশে ছবির মত বাড়ীটি।

শিউলির সাথে রজনীগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাসমদির ক'রে তুলছিল!

সকলেরি চোখ মন দু'ই যেন জুড়িয়ে গেল!

নাজিম সোজা হয়ে বসে বল্‌ল, "ওই দাবার গুঠি নিয়ে বস্‌লে কি আর এসব চোখে পড়ত?"

আজ্‌হার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, "সত্যিই তাই!"

মুখার্জী ব'লে উঠল, "নাঃ, এ শালার শিউলির ফুল আজ দাবা খেল্‌তে দেবে না দেখছি!"

আজ্‌হার বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠল, "তোমারও শিউলি! ফুলের সঙ্গে কোনো-কিছু জড়িত আছে নাকি হে?"

তার কিছু বলবার আগেই অজিত ব'লে উঠল, "আরে ছোঃ! দাবাড়ের আবার রোমান্স ! বেচারার জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে! নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়া! রাম বল! তাও—সে স্ত্রী চ'লে গেছেন বাপের বাড়ী—ঐ দাবার জ্বালায়! ওর আবার শিউলি ফুল!"

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল। মুখার্জী চ'টে গিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "তুই থাম অজিত ! পাগলের মত যা তা বক্‌লেই তাকে রসিকতা বলে না!"

অজিত মুখ চুন করার ভান করে বলে উঠল, "আমি ত রসিকতা করিনি দাদা। তুমি সত্যসত্যিই তোমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছ—দশজনে বদনাম দেয়, তাই আমিও বল্‌লাম। ওঁরা যদি তা শুনে হাসেন, তাতে আমার কি দোষ হ'ল?"

আজ্‌হার হেসে ব'লে উঠল, "এ কি তোমার অন্যায় অপবাদ অজিত? স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দাবাড়ের কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে না, এ তুমি কি করে জান্‌লে?"

অজিত বললে, "প্রথম মিস্টার মুখার্জী তারপর তোমাকে দেখে!"

আজ্‌হার বলে উঠল, "আরে, আমি যে বিয়েই করিনি।"

অজিত ব'লে উঠ্‌ল, "তার মানে, তোমার অবস্থা আরো শোচনীয়। ও বেচারা তবু অন্ততঃ স্ত্রীর সঙ্গে লভে পড়্‌ল, তোমার আবার স্ত্রীই জুট্‌ল না!"

নাজিম টেবিল চাপড়ে চে'চিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ব্রাভো! বেঁচে থাকুন অজিত বাবু! এইবার জোর বলেছেন!"

এমন সময় মালি শিউলিফুলের একজোড়া চমৎকার গো'ড়ে মালা টেবিলের উপরে রেখে চ'লে গেল। অজিত গম্ভীরভাবে মালা দু'টি ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখতেই সকলে হেসে উঠল। অজিত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিনয় করার সুরে ব'লে উঠল, "হে ব্র্যাকেট-সুন্দরী! আজি এই শুক্লা শারদীয়া নিশেতে এই সেঁউতি মালার—"

আজ্‌হার ম্লান হাসি হেসে বাধা দিয়ে বল্‌ল, "দোহাই অজিত। ও মালা নিয়ে বিদ্রূপ করিস্‌নে ভাই! ও মালা আমার নয়!"

অজিত না-ছোড় বান্দা! তার বিস্ময়কে চাপা দিয়ে সে ব'লে উঠল, "তবে এ মালা কার বন্ধু? থুড়ি—কার উদ্দেশে বন্ধু?"

নাজিম ব'লে উঠল, "দেখ, দাবাড়ের নাকি রোমান্স নেই?"

আজ্‌হার ব'লে উঠল, "আমি প্রতি বছর এমনি পয়লা আশ্বিন শিউলিফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দেই। এ মালা জলের—অন্য কারুর নয়।" মুখে বিষাদ-মাখা হাসি।

মায় দাবাড়ের দল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠে সব্‌ল। অজিত বয়কে হাঁক দিয়ে চা আন্‌তে বলে ভাল করে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ব'সে আজ্‌হারের দিকে চেয়ারটা ফিরিয়ে বলে উঠল, "তারপর, বলত বন্ধু, ব্যাপারটা কি! সঙীন নিশ্চয়ই! পয়লা আশ্বিন--প্রতি বছর শিউলি-মালা-জলে ভাসিয়ে দেওয়া চমৎকার গল্প হবে! ব'লে ফেল। নৈলে, এইখানে সকলে মিলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেবো!"

সকলে হেসে উঠল, কিন্তু সায় দিল সকলে অজিতের প্রস্তাবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর আজ্‌হার হেসে ব'লে উঠল, "কিন্তু তারও আরম্ভ যে দাবা খেলা দিয়ে!"

অজিত লাফিয়ে ব'লে উঠল, "তা হোক! ও পল্‌তার সুক্তো খেয়ে ফেলা যাবে কোনো রকমে, শেষের দিকে দই-সন্দেশ পাব।"

মুখার্জী ব'লে উঠল, " এ দাবা-খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশী থাক্‌বে হে! গজ ঘোড়া সব কাটাকাটি হয়ে যাবে! ভয় নেই।"

।।২।।

সকলের আর এক প্রস্থ চা খাওয়া হ'লে পর সিগার ধরিয়ে— মিনিটখানিক ধূম্র উদ্‌গীরণ ক'রে আজ্‌হার বল্‌তে লাগল।—

তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারী পাস ক'রে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনো পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু' একজন ক'রে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশী ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরো বেশী করে চাপল। সেখানে ইয়েট্‌স্‌, মিচেল, উইন্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নাম-করা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেমব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু' একজন দাবা-খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড় খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হারত। একদিন ওরির মধ্যে একজন ব'লে উঠল, 'একজন বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড় দাবাড়ে, শোনা যায়— তাঁকে কেউ হারাতে পারে না— যাবেন খেল্‌তে তাঁর সাথে?"

আমি তখনি উ'ঠে প'ড়ে বল্‌লাম, "এখনই যাব, চলুন। কোথায় তিনি?"

সে ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি। আপনার মত খেলোয়াড় পেলে তিনি বড় খুশী হবেন। তাঁরও আপনার মতই দাবা-খেলার নেশা। অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই!"

আমি ইউরোপে অনেকেরই "ব্লাইণ্ড ফোল্ডেড্‌" খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্লপঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশে যেন সাদামেঘের তরণীর বাইচ্‌ খেলা শুরু হয়েছে। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাস্‌ছে একবার উঠছে।

ইউকালিপটাস্‌ আর দেওদারু তরুঘেরা একটি রঙীন্‌ বাঙলোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি তরুণীর সঙ্গে দাবা খেল্‌ছেন।

আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়—শ্রদ্ধা—ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটি উঠে প'ড়ে, বল্‌লে, "বাবা, দেখ কা'রা এসেছেন!"

খেলাটা শেষ না হ'তেই মেয়ে উ'ঠে পড়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উ'ঠে বল্‌লেন, "আরে, বিনয় বাবু যে! এঁরা কারা? এস, বস। এঁদের পরিচয়—"

বিনয় বাবু—যিনি আমায় নিয়ে গেছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উ'ঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলেন, "আপনি- এই তুমিই আজ্‌হার? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড় খেলোয়াড়! ইয়েট্‌সের সঙ্গে বাজি চটিয়েছ, একি কম কথা! এইত তোমার বয়েস!—বড় খুশী হলুম— বড় খুশী হলুম ! ওমা শিউলি, একজন মস্ত দাবা'ড়ে এসেছেন ! দেখে যাও। বাঃ, বড় আনন্দে কাটবে তা হ'লে। এই বয়সেও আমার বড্ডো দাবা-খেলার ঝোঁক, কি করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেল্‌ছিলুম।" বলেই হো হো ক'রে প্রাণ- খোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত ক'রে তুললেন।

শিউলি নমস্কার ক'রে নীরবে তার বাবার পাশে এস বসল। তাকে দেখে আমার মনে হল, এ যেন সত্যই শরতের শিউলি।

গায়ে গোধূলি রং-এর শাড়ীর মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখঝানি—হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়ত একটু বেশীই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙ্‌ল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরী করতে করতে হেসে বলে উঠল, "বাবার বুঝি আর দেরী সইছে না?" ব'লেই আমার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, "কিছু মনে করবেন না! বাবা বড্ডো দাবা খেল্‌তে ভালবাসেন! দাবা খেল্‌তে না পেলেই ওঁর অসুখ হয়।" ব'লেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "এইবার চা খেতে খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি।"

বিনয় হেসে বল্‌ল, "হাঁ, এইবার সমানে সমানে লড়াই! বুঝ্‌লে মিস চৌধুরী, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত ক'রে দেন!"

খেলা আরম্ভ হ'ল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল, কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরী ওর্ফে শিউলি তার বাবার যা দু'একটি ত্রুটি ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম—এও এর বাবার মতই ভাল খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি— তাঁদের অনেকের চেয়েই বড় খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরী। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে জন্‌তাম বড় কেমিস্ট ব'লে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভাল দাবা খেল্‌তে পারেন, এ আমি জানতাম না।

আমি একটা বেশী বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ ক'রে ডিফেন্সিভ খেলা খেল্‌তে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শিউলি বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ এমন ভাল খেল্‌তে লাগলেন যে, আমি পাছে হেরে যাই এই ভয়ে খেলাটা ড্র ক'রে দিলাম! বৃদ্ধ

বারংবার আমার প্রশংসা করতে করতে বল্‌লেন, "দেখলি মা শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মত খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কি খেললে! বড় ভাল খেল বাবা তুমি! আমি হারি কিম্বা হারাই, ড সহজে হয় না!"

শিউলি হেসে বল্‌লে, "কিন্তু তুমি হারনি কত বৎসর বল ত বাবা!"

প্রফেসর চৌধুরী হেসে বল্‌লেন, "না মা, হেরেছি। সে আজ প্রায় পনর বছর হ'ল, একজন পাড়গেঁয়ে ভদ্রলোক—আধুনিক শিক্ষিত নন— আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ, ওরকম খেলোয়াড় আর দেখিনি!"

আবার খেলা আরম্ভ হ'তেই বিনয় হেসে ব'লে উঠল, "এইবার মিস চৌধুরী খেলুন না মিস্টার আজ্‌হারের সাথে!"

বৃদ্ধ খুশী হলে বল্‌লেন, "বেশ ত তুই-ই খেল্‌ মা, আমি একবারদেখি।"

শিউলি লজ্জিত হয়ে ব'লে উঠল, "আমি কি ওঁর সঙ্গে খেল্‌তে পারি?"

কিন্তু সকলের অনুরোধে সে খেল্‌তে বস্‌ল। মাঝে চেস্‌-বোর্ড একধারে চেয়ারে শিউলি— একধারে আমি! তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির ক'রে তুলছিল। আমার দেহে মনে যেন নেশা ধ'রে আসছিল। আমি দু' একটা ভুল চা'ল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নত ক'রে ফেললে। মনে হ'ল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থ-পূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় প'ড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয় বাবুর দল হেসে ব'লে উঠলেন— "এইবার মিস্টার আজ্‌হার মাত হবেন!" মনে হ'ল, এ হাসিতে বিদ্রূপ লুকানো আছে।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেল্‌তে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বো'ড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ্‌ খেলা খেল্‌তে শুরু ক'রে দিলাম যে, প্রফেসর চৌধুরীও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল! সে হেরে গেলেও এত ভাল খেলেছিল যে, আমি তার প্রশংসা না ক'রে পারলাম না। আমি বল্লাম—"দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড্‌-চ্যাম্পিয়ান মিস মেন্‌চিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশী বেগ পেতে হয়নি আমাকে। আমি ত প্রায় হেরেই গেছিলাম।"

দেখলাম, আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়নি-এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম।

প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে আবার খেলা হল, এবারও ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বল্‌লেন, "হাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গে খেল্‌তে হ'লে অন্ততঃ আঠ চা'ল ভেবে খেল্‌তে হয়!"

কথা হ'ল, এরপর রোজ প্রফেসর চৌধুরীর বাসায় দাবার আড্ডা বসবে।

উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ ব'লে উঠলেন, "মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিস্টার আজ্‌হারের নিশ্চয়ই বড্ডো কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না!" আমি ততক্ষণ ব'সে পড়ে বল্‌লাম, "বাঃ এ খবর ত জানতাম না।"

শিউলি কুণ্ঠিতস্বরে ব'লে উঠল, "এই শিখ্‌ছি কিছুদিন থেকে, এখনো ভাল গাইতে জানিনে!"

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিক্‌ল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা হোক—আমার মনে হতে লাগল— এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা— তার বেদনা নিবেদন।

এক একজনের কণ্ঠ আছে— যা শুনে এ কণ্ঠ ভাল কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ ক'রে দেয়! সে কণ্ঠ এমন দরদে ভরা—এমন অকৃতিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভালমন্দ বিচারের বহু ঊর্ধ্বে সে কণ্ঠ, কোনো কর্তব্য নেই, সুর নিয়ে কোন কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ প্রশংসাবাণী উথ্‌লে উঠে মুখে নয়—চোখে !

এ সেই কণ্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বল্‌তে গেলাম, "অপূর্ব!" গলার স্বর বেরুল না! শিউলির চোখে পড়ল—আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল।

হায়, সে যদি জানত—কালির লেখা মুছে যায়, জলের লেখা মোছে না !

সেদিন আমায় নিয়ে কে কি ভেবেছিল—তা নিয়ে সেদিনও ভাবিনি, আজও ভাবি না। ভাবি— শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এম্‌নি ক'রেই গান গাইত। গলায় তার দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ!

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরী ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয়— গলার ও কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত। কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে— এও যেন তেমনি।

গানের শেষে ব'লে উঠলাম, "আপনি যদি ঠুংরী শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী হতে পারেন ! কি অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর!"

শিউলিফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম ক'রে ব'লে উঠল, "না না, আমার গলা একটু ভাঙা! সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। জানেন যদি, গান্‌ না একটা গান!"

আমি একটু মুশ্‌কিলে পড়লাম! ভাবলাম, 'না' বলি। আবার গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে! বল্লাম, "আমি ঠিক গাইয়ে নই সমঝদার মাত্র ! আর, যা গান জানি, তাও হিন্দি।"

প্রফেসর চৌধুরী খুশী হয়ে ব'লে উঠলেন, "আহা হা হা! বল্‌তে হয় আগে থেকে! তা হ'লে যে গানটাই আগে শুন্‌তাম তোমার! আর গান হিন্দি ভাষায় না হ'লে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখ, ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হ'তেই পারে না। কীর্তন বাউল আর রামপ্রসাদী ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢং-এর গান চলে না।" আমি বললাম, "আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।"

গান করলাম। প্রফেসর চৌধুরী ত ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হ'বে কা'ল থেকে। শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয় বাবুর দলও ওস্তাদী গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধে দু'চারখানা খেয়াল ও টপ্পা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরীর সাধুবাদের আতিশয্যে আমার গানের অর্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরীই গাইলাম বেশী।

গানের শেষে দেখি, আমাদের পিছন দিকে আরো কয়েকটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় ক'রে দিল—"ইনি আমার মা— ইনি মামিমা— এরা আমার ছোট বোন।"

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'লাম। ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ। চোখ জ্বা'লা করে উঠল। মনে হ'ল, চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে— চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!

॥৩॥

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তাখানেকের পরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে প্রফেসর চৌধুরী বাড়ী থাক্‌তে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মত বয়ে যেতে লাগলো। কাজের মধ্যে দাবা-খেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম—প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবা-খেলা ত আছেই—তাঁকে গান সেখানোই হয়ে উঠল আমার পক্ষে সব চেয়ে দুষ্কর কার্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হ'ল, আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত ক'রে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিম'য় হ'ল না—হবেও না এ জীবনে কোনদিন— কিন্তু কণ্ঠ বদল হয়ে গেল! আর মনের কথা—সে শুধু মনই জানে!

অজিত বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, "কণ্ঠ না কণ্ঠী বদল বাবা? শেষটা নেড়ানেড়ীর প্রেম? ছোঃ!"

আজহার কিছু না ব'লে আবার সিগার ধরিয়ে ব'লে যেতে লাগল—

একদিন ভোরে শিউলির কণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল। সে গাচ্ছিল—

"এখন আমার সময় হ'ল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।"

গান শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হ'ল— আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভ'রে এল।

আশাবরী সুরে কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়েছিল! আজ প্রথম শিউলির কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠং ক'রে কিসের শব্দ হ'তেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দু'টি কর-পল্লব ভরে শিউলি ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিণীর মত আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না ক'রে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি কালই যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত ক'রে আস্তে বল্‌লাম—"হাঁ ভাই!" আরো যেন কি বল্‌তে চাইলাম। কিন্তু কি বল্‌তে চাই ভুলে গেলাম।

শিউলি, শিউলি ফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনস্কভাবে অধরে কপোল ছুঁইয়ে বললে, "আবার কবে আসবেন।"

আমি ম্লান হাসি হেসে বল্‌লাম, "তাও জানিনে ভাই! হয়ত আসব!"

শিউলি ফুলগুলি রেখে চ'লে গেল। আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না।

আমার সমস্ত মন যেন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল— ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি; জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না!

এক মাস ওদের বাড়ীতে ছিলাম। কত স্নেহ কত যত্ন, কত আদর। অবাধ মেলা-মেশা—সেখানে কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এসব ছিল না ব'লেই বুঝি এতাদিন ধরে এত কাছে থেকেও কারুর করে কর-স্পর্শটুকুও লাগেনি কোনোদিন।এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয়নি মনে। একজন অসীম আকাশ— একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই— প্রশ্ন নেই, শুধু এ ওর চোখে, ও এর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।

কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না! সেও যেন জানে— আমাকে চ'লে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি— আমাকে যেতেই হবে।

নদীর স্রোতই যেন সত্য—অসহায় দুই কূল এ ওর পানে তাকিয়ে আছে–অভিলাষ নাই—আছে শুধু অসহায় অশ্রু চোখে চেয়ে থাকা।

সে চ'লে গেলে টেবিলের শিউলি ফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে রাখলাম। মনে হ'ল, এ ফুল পুজারিণীর—প্রিয়ার নয়। ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।

চোখ তুলেই দেখি, নিত্যকার মতই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বল্‌ছে—"আজ আর গান শেখাবেন না?"

আমি বল্‌লাম— "চল, আজই ত শেষ নয়।"

শিউলি তার হরিণ-চোখ তু'লে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হ'ল ব'লে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া—যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধূলায় ঝ'রে পড়বে।

এ যেন পরীর দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে!

এ যেন মায়া-মৃগ— ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে!

গান শেখালাম—বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সব কিছুর গান। বিদায় বেলা ত আসবেই—তবে ওর কথা ব'লে ওর সব বেদনা সব মাধুর্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক— নির্মেঘ— নিরাভরণ। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে বললাম— আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য ভালমানুষ সেজেছে ত! কোনো বেশভূষা নেই।

বল্‌তেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরী ব'লে উঠলেন,— "সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে!"

এক একটি কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম । এই শান্ত সৌম্য মানুষটির বুকেও কি ঝড় উঠেছে বুঝলাম। মনে মনে বল্‌লাম—তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়! তোমাকে ত ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!

বৃদ্ধ বুদ্ধি মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন— "আমি অতি ক্ষুদ্র বাবা! পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ! তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হ'তেই ইচ্ছা করে।"

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শিউলি আমদের সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল— "এই যে সন্ধ্যা দেবী!" বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম!

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টক্‌টকে লাল রং-এর শাড়ী। ওকে লাল শাড়ী পরতে আর কোনদিন দেখিনি। মনে হ'ল, সারা আকাশকে

বঞ্চিত ক'রে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে! তার দেহে রক্ত-ধারা রং-এর শাড়ী, তার মনে রক্ত-ধারা,—মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া! চোখ যেমন পুড়িয়ে গেল, তেমনি মনে পূরবীর বাঁশী বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা বাংলা গান শিখেছিলাম। আমি বল্‌লাম—"একটা গান গাইব?" শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে প'ড়ে বল্‌ল— "গান!"

আমি গাইলাম—

'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এল
সোনার গগন রে!"

প্রফেসর চৌধুরী উ'ঠে গেলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, "বাবাজী, আজ একবার শেষবার দাবা খেল্‌তে হবে!"

চৌধুরী সাহেব উঠে যেতে আমি বল্‌লাম—"আচ্ছা ভাই শিউলি, আমার যখন এমনি আশ্বিন মাস— এম্‌নি সন্ধ্যা আসবে— তখন কি করব বল্‌তে পার?"

শিউলি তার দু চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় ক'রে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল,—'শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও!"

আমি নীরবে সায় দিলাম— তাই হবে! জিজ্ঞাসা করলাম-"তুমি কি করবে!" সে হেসে বললে, "আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে !"

আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকিচিক ক'রে উঠল।

রাত্রে দাবা—খেলার আড্ডা বসল। প্রফেসর চৌধুরী আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি শিউলির কছে হেরে গেলাম ! জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার ! আর সেই হারাই আমার গলার হার হ'য়ে রইল।

সকালে যখন বিদায় নিলাম—তখন তাদের বাঙলোর চার পাশে উইলোতরু তুষারে ঢাকা পড়েছে !

আর তার সাথে দেখা হয়নি— হবেও না! একটু হাত বাড়ালেই হয়ত তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলি ফুল--বড় মৃদু, বড় ভীরু, গলায় পরলে দু দণ্ডে আঁউরে যায়! তাই শিউলি ফুলের আশ্বিন যখন আসে— তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই।

-০-